ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ঋষি বলিলে কোন দোষ হয় না।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের ১ম অনুবাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঋষির পরিবর্ত্তে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া দেখিতে পাই। যথা,—"নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।" আমরা এখানে বাসুদেবের কথা পাইতেছি। কিন্তু বাসুদেবের দ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণকেই লক্ষ্য করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা ইহাও অবগত হইতেছি যে, যখন বেদসঙ্কলিত হইয়াছিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

বেদের অনেকস্থলে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নামে একজন ঋষি ছিলেন, কৃষ্ণ নামে একজন অনার্য্য রাজা ছিলেন। সুতরাং পাণিনিতে যদি 'কৃষ্ণ' শব্দের উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে নাও পারিত। কিন্তু রামায়ণে, পাণিনিসূত্রে, বেদসংহিতায় এবং অন্যান্য স্থানে "বাসুদেব" নাম পাওয়াতে আমরা উহাকে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

বেদব্যাস বেদসঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাসেরও সমসাময়িক।

এখন বেদব্যাসের বেদ সঙ্কলন সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, তাহা কতদূর সত্য, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—
ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্‌ব্যস্তুং প্রচক্রমে
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্‌॥"

অর্থাৎ, ব্রহ্মার আদেশক্রমে ব্যাস বেদসমূহের সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বেদপারগ চারিজন শিষ্যকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই চারি জন শিষ্যের নাম পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত্র। বেদব্যাসের বহু পূর্ব্বে ঋক, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সকল প্রচলিত ছিল। তাঁহার পূর্ব্বতন ঋষিগণ বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে ঐ সকল মন্ত্র আর্য্যসমাজে প্রচারিত করিয়াছিলেন। বেদব্যাস শিষ্যদিগের সাহায্যে সেই সকল মন্ত্র একত্র সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। তিনি বেদ চতুষ্টয়ের ব্যাস (Compiler) মাত্র, কর্ত্তা বা রচয়িতা (Author) নহেন।

বেদ চতুষ্টয়ের সংকলন সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষিচ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজন্নথর্ব্ববেদেন সর্ব্ব কর্ম্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ! ব্রহ্মতত্ত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥"

(৩।৪।১৩—১৪)

অর্থাৎ পরে ব্যাস ঋক্ সমূহের উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সঙ্কলন করিলেন; যজুঃ সমূহের উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদ এবং সাম সমূহের উদ্ধার করিয়া সামবেদ সঙ্কলন করিলেন। এবং তিনি অথর্ব্ব বেদের দ্বারা যথা বিধানে ব্রহ্মত্ব স্থাপন এবং রাজার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, বেদের মন্ত্র সকল পূর্ব্ব হইতে বিক্ষিপ্ত আকারে বর্ত্তমান ছিল। ব্যাসদেব ঐ সকল মন্ত্র সংগৃহীত করিয়াছিলেন। যেমন বঙ্গদেশে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী

কবিওয়ালাদিগের গীত সমুদয় একত্র করিয়া সঙ্কলন করিয়াছিলেন, অথবা যেমন ইংলণ্ডে বিসপ পার্শি (Percy) প্রাচীন গাথা সমূহ (ballads) সংগৃহীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্যাসদেব বেদসংহিতার মন্ত্র সকল সংগৃহীত (compile) করিয়াছিলেন।

সুতরাং বেদব্যাস যে বেদসঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদ মিথ্যা নহে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বেদসংগ্রহ-কর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক; তিনি উপন্যাসের কল্পিত নায়ক নহেন।

(ঙ) পুরাণের ঐতিহাসিকতা।

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণ যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ করিতেছে, তাহাতে আর কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে পুরাণ সকল আধুনিক। সহস্র বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। পুরাণগুলি এমন আধুনিক যে উহারা কালিদাসের পরে রচিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা পুরাণগুলিকে বিশ্বাস করিতে পারি না।

এ যুক্তির যে সারবত্তা কতদূর, তাহা বিবেচ্য। আমরা কালিদাসের মেঘদূতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দেখিতে পাই। যথা,—

"যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে।
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"
(১।১৫ শ্লোক)

এখানে ময়ূর পুচ্ছ দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনু-শোভিত মেঘের তুলনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুর কোন কালে গোপবেশ ছিল না, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণেরই গোপবেশ ছিল। শ্রীকৃষ্ণেরই ময়ূর পুচ্ছ চূড়া ছিল। কিন্তু এই ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার কথা এক পুরাণ এবং তদনুবর্ত্তী কাব্য ভিন্ন, বেদে মহাভারতে এবং রামায়ণে নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে,যে কালিদাসের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি যে, খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বেও যে পুরাণ প্রচলিত ছিল, তাহা অবগত হওয়া যাইতেছে।

পুরাণের পৌরাণিকতা সম্বন্ধে আরও অন্যান্য প্রমাণ আছে। পুরাণের কথা, শতপথ ব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়নসূত্রে অথর্ব্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মনুসংহিতায়, মহাভারতে এবং রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। দুই একটী প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আশ্বলায়নসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"আয়ুষ্মতাং কথাঃ কীর্ত্তয়ন্তো মাঙ্গল্যানীতিহাস পুরাণানীত্যাখ্যা পয়মানাঃ।"
(আশ্বগৃহ, ৪।৬)

কোন সময়ে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বিদ্যা যাচ্ঞা করেন। তাহাতে সনৎকুমার নারদকে প্রশ্ন করিলেন যে, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহার পরিচয় বল; তদুপরে যাহা শিক্ষণীয় তাহা শিখাইব। তদুত্তরে নারদ বলিলেন,—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং বেদানাংবেদং * * * ভগবোঽধ্যেমি।"

(ছান্দোগ্য—৭—১—২)

অর্থাৎ, আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন

করিয়াছি, পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যকের ২য় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণঃ বিদ্যা * * *।" (২—৪—১০)

এই তালিকায় পুরাণের কথাও পাওয়া যায়। সুতরাং বৃহদারণ্যক রচনায় পূর্ব্বকালেও ইতিহাস এবং পুরাণ বর্ত্তমান ছিল।

অথর্ব্ববেদে উক্ত হইয়াছে যে,—

"ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।"

(অথর্ব্ব—১১- ৭—২৪)

এখানে পুরাণের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের অপেক্ষাও প্রাচীনতর শতপথব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডে চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতির কথা আছে। সুতরাং পুরাণ আধুনিক কালে রচিত নহে। বৈদিক সাহিত্যসকল, রামায়ণ এবং মহাভারত বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতে পুরাণ বলিয়া একপ্রকার সাহিত্য (literature) চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, আধুনিক পুরাণগুলি এখন যে আকৃতিতে পাওয়া যায়, পুরাকালে উহারা ঐরূপ ভাবে রচিত হয় নাই। আদি অবস্থার পুরাণের নাম পুরাণ-সংহিতা, উহা অতি প্রাচীন আর্য্যসংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। পরে উহা হইতে ১৮শ পুরাণ রচিত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে আমরা পুরাণ বলিয়া যে সাহিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা কেমন করিয়া এবং কখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি অষ্টাদশ পুরাণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহা বিবেচ্য। আপস্তম্বগৃহ্য সূত্রে আমরা অন্ততঃ একখানি পুরাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। ভবিষ্যপুরাণ হইতে আপস্তম্বগৃহ্যসূত্রে কিঞ্চিৎ বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা আর্য্যসংস্কৃতে রচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে জাবাদ্বীপ হইতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অন্ততঃ ৫০০ খ্রীঃ অব্দে উহা জাবাদ্বীপে নীত হইয়াছিল। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের মহারাজের পুস্তকাগারে স্কন্দপুরাণের অংশবিশেষ পুঁথি আকারে পাইয়াছেন। ইহাও স্থির হইয়াছে যে, অন্ততঃ ৬০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে এই পুঁথি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পুরাণগুলি আধুনিক কালে রচিত বলিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহা যে অন্তঃসারশূন্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভবিষ্যপুরাণের অংশবিশেষ আপস্তম্বসূত্রে গৃহীত হওয়ায়, আমরা ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারি যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ১৮শ পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে; এবং পুরাণ সকলের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ॥ ১৬
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহা-

মুন্সিঃ ॥১৭

সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রযুঃ শাংশপায়নঃ ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্যচা-
ভবন্ ॥ ১৮
কাশ্যপাঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ ।
রোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা ॥১৯
চতুষ্টয়েনাপ্যোক্তেন সংহিতানামিদং মুনে ॥২০
(৩য় অংশ, ষষ্ঠ অধ্যায়)

অর্থাৎ পুরাণার্থ বিশারদ ভগবান্ বেদ-ব্যাস আখ্যান উপাখ্যান গাথা ও কল্পশুদ্ধির সহিত পুরাণ সংহিতা রচনা করিলেন। বেদব্যাসের সূতজাতীয় রোমহর্ষণ নামে বিখ্যাত একজন শিষ্য ছিলেন। মহামুনি ব্যাস তাঁহাকে পুরাণ সংহিতা অধ্যয়ন করাই-লেন। রোমহর্ষণের ছয় জন শিষ্য। তাঁহা-দের নাম—সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রযু, শাংশ-পায়ন, অকৃতব্রণ ও সাবর্ণি। কাশ্যপ-বংশীয় অকৃতব্রণ সাবর্ণি ও শাংশপায়ন, ইঁহারা রোমহর্ষণ হইতে অধীত মূল সংহিতা অব-লম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণসংহিতা রচনা করেন। হে মুনে। ঐ চারি সংহিতার সার গ্রহণ করিয়া আমি (পরাশর) এই বিষ্ণু-পুরাণ-সংহিতা রচনা করিয়াছি।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিষ্ণুপুরাণ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাস রচিত নহে; বরঞ্চ ব্যাস রচিত মূল সংহিতা এবং তদবলম্বনে লিখিত তিনখানি পুরাণ-সংহিতার সার অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ভাগবত, বায়ু এবং অগ্নিপুরাণাদিতে পুরা-ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই প্রকার আখ্যানই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা হইতে এই-রূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই সময়ে যে সকল পৌরাণিক তথ্য প্রচলিত ছিল—যাহাকে উপনিষদ, রামায়ণ এবং মহাভার-তাদি গ্রন্থ সকল "পুরাণ" বলিয়া বর্ণনা করি-য়াছেন—তাহাদিগকে ব্যাসদেব একত্রে গ্রথিত (compile) করিয়াছিলেন। ইহাই পুরাণ-সংহিতা নামে খ্যাত হইয়াছিল। তৎ-পরে তাঁহার তিনজন প্রশিষ্য পুরাণ-সংহি-তাকে ভিত্তি করিয়া, পুরাণের অপর তথ্য-সকল সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেকে এক একখানি পুরাণ রচনা করেন। এই চারখানি পুরাণ-সংহিতাই অষ্টাদশ পুরাণের মূল স্বরূপ। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, ১৮শ পুরাণ গুলির যথার্থ রচয়িতা কে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে না পারিলেও, ব্যাসদেব যে উহাদের রচয়িতা বলিয়া প্রবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা কতক পরিমাণে সত্য, কারণ ঐ সকল পুরাণগুলিই তাঁহার মূল পুরাণ-সংহিতার যোজনা (adaptations) মাত্র।

কোন্ পুরাণ খানির পর অপর কোন্ পুরাণ রচিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরা-ণাদিতে যে প্রবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিবার এ পর্য্যন্ত কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যখন আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র রচিত হয়, তখন খুব সম্ভবতঃ এই সকল পুরাণ গুলিই প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, অষ্টাদশ পুরাণ গুলি আমরা মৌলিক আকারে প্রাপ্ত হই নাই। উহাদের ভাষা, বিষয়-সন্নিবেশ এবং বিষয় সকল ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকৃত হই-য়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্কিম বাবু দেখাই-য়াছেন যে, আধুনিক ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে—যে ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের সূচী মৎস্যপুরাণে নিবদ্ধ হই-য়াছে, তাহা হইতে—অনেকাংশে বিভিন্ন। সমুদয় পুরাণ সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুজ্য হইতে পারে। আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর যখন হিন্দুধর্ম্মের

পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন সকল পুরাণেরই পুনঃ সংস্করণ হইয়াছিল। সেই সময়ে যাহার যাহা ভাল লাগিয়াছিল, তিনি তাহা ইহাদের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, আমরা যখন পদ্মপুরাণে শঙ্করাচার্য্যের অথবা শ্রীচৈতন্তের কথা এবং ভবিষ্যপুরাণে নানকের কথা দেখিতে পাই, তখন পুরাণ গুলির কিরূপ সংস্করণ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। অতি অল্প দিনের ভিতর কৃত্তিবাসের রামায়ণের কিরূপ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে, আপস্তম্বের সময়ের প্রচলিত পুরাণগুলি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক পুরাণরূপে পরিণত হইয়াছে,তাহা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

মূল অষ্টাদশ পুরাণগুলি কোন্ সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার অন্যান্য উপায় আছে। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণু পুরাণখানি লওয়া যাউক। বিষ্ণুপুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে,—

"অভিমন্যোরুত্তরায়াং পরীক্ষিৎযজ্ঞে। যোয়ং সাম্প্রতং এতদ্ ভূমণ্ডলং অখণ্ডায়তি ধর্ম্মেন পালয়তি।"

ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, পরীক্ষিতের রাজত্ব কালে এই পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এইরূপ আমরা মৎস্য পুরাণে দেখিতে পাই যে,—"যজ্ঞেহধীসীমাখ্যঃ সাম্প্রতং যো মহাযশাঃ, ইত্যাদি।" সুতরাং অধীসীমের রাজত্বের সময়ে মৎস্যপুরাণ রচিত হইয়াছে।

পুরাণগুলি যবেই রচিত হউক না কেন, উহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন গদ্য সংস্কৃতে রচিত অংশবিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন যে, মূল পুরাণসংহিতার অংশ বলিয়াই উহাদিগকে পদ্যে রচিত পুরাণগুলির মধ্যে স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণের মধ্যে আমরা এই রূপ গদ্য পাইয়া থাকি। যথা,—

"যত্র যদুবংশে ভগবান্ অনাদিনিধনো বিষ্ণুরবততার। ভগবান্ অনাদিমধ্যো দেবকী-গর্ভে সমবততার বাসুদেবঃ।"

পুরাণসংহিতায়ও যে শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, তাহা ইহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পুরাণগুলি বিশেষ লক্ষ্যের সহিত পাঠ করিলে, ব্রাহ্মপুরাণখানি যে উহাদের মধ্যে প্রথম পুরাণ বলিয়া প্রবাদ আছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই হয় না। খুব সম্ভবতঃ ব্যাস রচিত আদিম সংহিতা এবং তাঁহার প্রশিষ্যগণ রচিত তিনখানি পুরাণ-সংহিতার সহিত ব্রাহ্মপুরাণখানির মিল আছে। কারণ ব্রাহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আখ্যান গুলির অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, একই মূল সংহিতা অথবা একই তিনখানি পুরাণসংহিতা হইতে ঐ দুই খানি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একখানি পুরাণ অপরখানি হইতে ঐ সকল অংশ অবিকল চুরি করেন নাই; কারণ তাহা হইলে সর্ব্বত্রই মিল দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু আমরা সর্ব্বত্র ঐ রূপ মিল দেখিতে পাই না। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অংশ বিশেষ লওয়া যাউক। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, ১৩শ অধ্যায়, ২৫ হইতে ৪০ শ্লোক পর্য্যন্ত, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর গোপিরা কি করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। কিন্তু ব্রাহ্মপুরাণে কেবল মাত্র একটী শ্লোকে

ঐ বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে,—গোপিরা শ্রীকৃষ্ণে মগ্ন হইয়া তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মপুরাণে যাহা একটী শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া ২৬টী শ্লোক বিবৃত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ব্রাহ্ম পুরাণ খানি সর্ব্ব প্রথমে রচিত হইয়াছে, তৎপরে বিষ্ণুপুরাণাদি রচিত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মপুরাণ খানি মূল সংহিতা গুলির উপাখ্যান অংশ বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গের অংশসকল সম্বন্ধে ব্রাহ্মপুরাণের সহিত বিষ্ণুপুরাণের মিল দেখিতে পাওয়াতে ইহা স্থির হইতেছে যে, ব্রাহ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণ, উভয়েই ঐ সকল অংশ মূলসংহিতাগুলি হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান বর্ত্তমান আছে, উহারা ব্যাসদেব রচিত মূলসংহিতারই অনুযায়ী। সুতরাং ব্রাহ্মাদি পুরাণ গুলি যে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, উপন্যাসের নায়ক নহেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

দেব-শক্তি।

ভ'রে ছিল আঁখি দুটী প্রলয়ের আঁধিয়ায়,
বুকের কম্পন রাশি, হয়েছিল মৃতপ্রায়,
বাহির হইতেছিল ভয়ে ভয়ে, কৃশ-শ্বাস,
বুকেতে বসিয়াছিল, ধ্যানমগ্ন হা হুতাশ,
একটুকু শান্তি বুঝি, এনেছিল তন্দ্রা-রাণী,
এমন সময় যেন শুনিলাম কার বাণী।—

"এস নাথ এস ফিরে, আমারে হৃদয়ে ধর,
অপরাধ করিয়াছি, হে দেবতা, ক্ষমা কর,
অন্ধকার আঁখি 'পরে,আর না থাকিতে দিব,
অধরে যতেক ধান্ত চুমিয়া, চুষিয়া নিব";

'প্রেয়সিরে এসো ধীরে,কাছে বসে কথা কও!
রূপহারা অন্ধ-আঁখি রূপেতে ফুটা'য়ে লও,
চম্পক লাবণ্যে ভরা মুখের পেলব কান্তি,
মায়া-দীপ্ত চোকে দেখে অন্তিমে লভিগো
শান্তি।"

"পদমূলে বসি নাথ সেবিব চরণদ্বয়,
ভুলে যাও পূর্ব্ব কথা পিশাচীর অভিনয়।"

"বুক যে গিয়াছে ভেঙে, হৃদয়েতে নাহি বল
জীবনের শেষ দিনে রাখ বুকে করতল।"

"ভাঙা বুক জোড়া দিব, এইবুক ভেঙে চুরে,
মর্ম্ম-রক্ত মাখাইয়া ব্যথায় তাড়াব দূরে,
প্রেমসুরা, সঞ্জীবনী তোমারে করা'ব পান,
হাসিয়া উঠিবে পুন, বিষাদ নিষিক্ত প্রাণ"

"কেন প্রিয়ে কেন কহ আবার প্রেমের কথা,
কেন প্রাণে তুলিতেছ অযাচিত ব্যাকুলতা?
প্রেম তো স্বপ্নের সুর,হৃদয়েতে ধ'রে রাখা,
নেশায় বিভোর হ'য়ে হেসে কেঁদে বেঁচে থাকা।"

প্রেম নহে স্বপ্ন নাথ, প্রেম শিখা অলকার
প্রেম-স্পর্শে জায়াপতি পান শক্তি দেবতার।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

নব্যরাষ্ট্রে লোকচিকিৎসা প্রশ্ন।

"We stand in a momentous time—a seething mass—in which the mind has made a sudden bound, left its old shape behind and is gaining new. The whole bulk of our ideas, the very bands of the world are rent asunder and collapse like a dream. *Mind is preparing a new start.*"

Hegel.

জড়তা-মুক্ত নব্যরাষ্ট্রে দিন দিন নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতেছে। দেশ স্বীয় করচ্যুত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পদ্ধতি আবার করায়ত্ত করিতে চাহে। বিরাট সলিলোচ্ছ্বাসবৎ ভাব-স্ফীতির যে অভিনব শরীর কম্পন রাষ্ট্র-বক্ষে কূল ছাপিয়া উঠিতেছে, তাহা নদীর শাখা-জালের প্রত্যন্ত ভাগের ন্যায়, সমাজের সীমা-প্রান্ত পর্য্যন্ত নীল স্বচ্ছজলপ্রবাহে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। যাহা কর্দ্দমের মলিন আবরণে পল্লীবক্ষ-নিষিক্ত নদী শাখার অস্পষ্ট জটিল বক্ষে লুক্কায়িত ছিল, তাহা হঠাৎ উর্ম্মি-সঙ্গ-শীর্ষে স্ফটিক-চূর্ণ-শুভ্র ফেন-কীরিটে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

লোক চিকিৎসার প্রশ্ন কি নিতান্ত গুরুতর ব্যাপার নহে? আমরা লোক-শিক্ষা বিস্তৃতির জন্য নানা নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছি—প্রাইমারী শিক্ষাকে যথাসম্ভব জাতীয় শিক্ষাদর্শের অন্তর্ভূত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সমাজ-সোপানে এখন একটী শ্লথতল অন্ধকূপ রাখিয়াছি, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে সকলকে অনুভব করিতে হয়, যাহার নিবিড় গভীর মলিন আলিঙ্গন পল্লীবক্ষে হাহাকার তুলিয়া দেয়, যাহা অহরহ আমাদের জনসাধারণকে হতশক্তি করিয়া তোলে।

বর্ত্তমান বহুমুখী কর্ম্মবিপ্লবে আমাদের সুস্থ শরীর, মুক্ত চিত্ত প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষা, কর্ম্মের মাঝে এবং ভাবের মাঝে তাহাই অঙ্কিত করা চাহি। মারাত্মক দুর্ব্বলতার ক্ষত চিহ্ন নব্যশিক্ষার অমৃত পল্লবে যেন গৃহ কোণেও থাকিতে পারেনা। অন্ততঃ নব্যযুগের ভাব-উৎস-মুখে যেন সমাজ-শরীরে কোথাও ভাবের অসামঞ্জস্য না থাকে। জৈবিক স্বাস্থ্যের ন্যায়, আমাদের ভাব-রাজ্যের কোন প্রকোষ্ঠ যেন লৌহ অর্গলে রুদ্ধ এবং অস্পর্শ্যস্পর্শ থাকিয়া সর্ব্বত্র ভাব-শোণিত সঞ্চালনের পথ বন্ধ করিয়া না তোলে।

অন্তর্নিহিত শক্তির অমোঘতার প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ দেশ যতদিন তৎপ্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিও করে নাই, ততদিন সকলের কর্ত্তব্য-কার্য্যের তালিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি যে অঙ্কের অভিনয় হইতেছে, উহার নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সেকেলে চাপ-রাশী খানসামা বা কোতোয়াল পেয়দা মাত্র নহে—রাজা ও রাণী স্বয়ং। ভারতবর্ষ আমাদের, ভারতের কার্য্য আমাদের কার্য্য, আমাদের এই নিজের দেশে নিজকেই মুক্ত ভাবে কাজ করিতে হইবে। বিদেশী রাজবংশ বাঙ্গালার দেওয়ান পদ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কর্ম্মভার নৃপতির কর্ত্তব্যরূপে ধীরে ধীরে সমাজ হইতে আত্মসাৎ করিয়াছে, পুনরায় তাহা আমাদিগকে স্কন্ধে বহিতে হইবে।

ভারতের বিদেশী রাষ্ট্রনীতি আমাদের সনাতন সমাজের অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যবস্থাপকের মতে রাষ্ট্রাধিপতির কর্ত্তব্য-সীমা যত সংক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল। জন ষ্টুয়ার্ট মিল যে রাষ্ট্রবাদের আদর্শ ইউরোপে প্রচার করিয়াছেন, তাহা তৎপ্রণীত স্বাধীনতা এবং অর্থনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গবর্ণমেণ্ট মাত্রেরই Laissez-faire theory" অবলম্বন করা উচিত, অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট সামাজিক নানা ব্যাপারে যত অল্প হস্তক্ষেপ করেন, ততই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু তিনি, প্রয়োজন বোধ হইলে, শিক্ষা, শ্রমজীবীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ের প্রতিবিধান করাও গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য মনে করেন।

বিখ্যাত মনীষী Humboldt মনে করেন, শিক্ষা, ধর্ম্ম এবং নৈতিক স্বাস্থ্য বিধানাদি বিষয়ে কিছুতেই রাজশক্তির হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

হার্বার্ট স্পেন্সার মহোদয়ের মতামত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তিনি বলেন, ধন, প্রাণ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে রাজশক্তির রূঢ় স্পর্শ সমীচীন নহে। কাজেই তাঁহার মতে বাণিজ্য ব্যবস্থা, ধর্ম্ম ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় রাজশক্তি-বহির্ভূত সমাজের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়াই মঙ্গলজনক।

কিন্তু মনীষীগণের উপরোক্ত আদর্শ এখনও ইউরোপ অবলম্বন করিতে সক্ষম হয় নাই। ইউরোপ এতদুপযোগী শান্তি ও সংযম সহসা লাভ করিতে পারিবে, এখন বিশ্বাস হয় না। একথা ইউরোপীয়গণই স্বীকার করেন—কাজেই আমার বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

যদি বলি, প্রাচীন দার্শনিকগণের দূরদৃষ্টি বশতঃই হোক, কিম্বা ঘটনাবর্ত্তের রহস্যময় বিবর্ত্তনেই হোক, ভারতবর্ষে এই আদর্শের ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তবে সম্প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ সহ্য করিতে হইবে না, এবিশ্বাস যেমন আমার আছে, তেমনি ক্ষুদ্র-দৃষ্টি-পল্লবগ্রাহী, অতীত ভারতের সেকেলে মজ্জাহীন, মলিন, সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ-পুষ্ট মৃত-হাস্য-কঙ্কাল-চূর্ণের ক্ষীণ আঘাত হইতে মুক্তি পাইব—বর্ত্তমানের গৌরব মুক্ত নব্যভাব-বিধুর সমাজে এ কথা আশা করাও, বোধ হয়, তেমন বেশী কিছু নহে।

ভারতের প্রাচীন সমাজবিদ্‌গণ নৃপতির কর্ত্তব্যক্ষেত্র নিতান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায় পূর্ণ বৃহৎ মনুসংহিতার মাত্র সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায় রাজধর্ম্ম-বিচারে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহ, ধন এবং রাষ্ট্ররক্ষা ছাড়া রাজার অন্য কোন কর্ম্ম নাই। উপরোক্ত অধ্যায়ে কেবল এই সমস্ত বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষাদীক্ষা, অতিথিসৎকার, স্বাস্থ্যরক্ষা, দুর্ব্বলের এবং পীড়িতের সেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতির উপর রাজার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সমাজ সেই ভার আবহমান কাল হইতে স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছে। অবশ্য এই সমাজ এবং সমাজপতি উভয়ই সনাতন আর্য্যধর্ম্মকে স্বীকরণ মৌলিক ব্যাপার মনে করিয়াছে।

বৌদ্ধ ভারতবর্ষেও এই আদর্শ মোটামুটি অক্ষত ছিল। কিন্তু তাৎকালিক ধর্ম্মসঙ্ঘর্ষের প্রভাবে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিধি কর্ত্তৃক অনুচালিত হওয়ায়, নৃপতি অশোক, নানা বিষয়ে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভাব-বিপ্লবের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে

উহা নানা কারণে প্রয়োজনীয় ছিল। অশোকের নব রাষ্ট্রধর্ম্ম শান্তি এবং প্রেমের ভিতর দিয়া প্রচারিত হয়। প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ কিম্বা বলপ্রয়োগ করা হয় নাই।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতি এবং বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিরাট প্লাবনে সমাজ অনেকটা উলট-পালট হইয়া উঠে। পুরাতন জীর্ণ ব্যবস্থা প্রভৃতি অন্তর্হিত হওয়ার এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, অশোক, সমাজের সম্মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা এবং মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য, অনেক বিরাটকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এই জন্য প্রচারের দ্বারা শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অশোক ক্ষান্ত হন নাই। স্থানে স্থানে কূপ এবং তড়াগ খনন, বৃক্ষাদি রোপণ,বিশেষতঃ রাজ্যের সর্ব্বত্র সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া প্রজা-সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। Mr Robert Cust অশোকের চতুর্দ্দশ অনুশাসনের যে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দু'একটা উল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রাণীহত্যা নিবারণ।

(২) মানব এবং ইতর জন্তুর চিকিৎসা বিধান, বৃক্ষাদি রোপণ প্রভৃতি।

(৩) নৈতিক স্বাস্থ্যবিধানের জন্য পর্য্যবেক্ষক নিযুক্তি।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি,এই সামান্য রাজকর্ত্তব্যের পরিধি-বিস্তৃতি তৎকালে প্রয়োজন ছিল।

নৃপতি ও প্রজা সমদেশবাসী এবং সমান প্রকৃতিযুক্ত হইলে ইহাতে তেমন কোন অনিষ্ট হয় না। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-বহির্ভূত সমাজ-সাধারণ ইহাতে মুক্ত আত্মশক্তির সম্যক্ ব্যবহারে সমর্থ হয় না—কিন্তু পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলে কোন বিষয়ে আশঙ্কার কারণ থাকে না। বিশেষতঃ নৃপতির পক্ষে কোন উচ্চভাব কিম্বা কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া দোষাবহ নহে, তবে তদ্দ্বারা সাধারণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়া শেষোক্তের যাবতীয় চেষ্টা নির্ম্মূল না হইলেই হইল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া বহুকাল হইতে আমরা নিজকে এত অক্ষম মনে করিয়াছি যে, ধীরে ধীরে কখন আমাদের পক্ষাঘাত-রুগ্ন হস্ত হইতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সম্ভ্রম প্রভৃতির ব্যবস্থাযন্ত্র কিরূপে "ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড" এবং সরকারী পেয়াদা চুরি করিল ,তাহা ঠিক করিতে পারি নাই।

অনতিকাল পূর্ব্বেও যে এই সমস্ত ব্যাপার আমাদের হস্তে ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের নবাবগণের হাতে কেবল রাজস্ব আদায়, শান্তিরক্ষা, সৈন্যসজ্জা, অস্ত্র ছিল—অন্যান্য সর্ব্ববিধ মঙ্গলকৃত্য দেশের মৌন-সমাজের অক্ষয়-সাহচর্য্যে সম্পন্ন হইত।

দেশের এবং সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ দুইটী কর্ত্তব্য রহিয়াছে। শিক্ষাবিধান এবং আত্মরক্ষা। প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত কার্য্য আমরা হস্তে লইয়াছি। শেষোক্তের জন্য শারীরচর্চ্চা এবং সালিসী আদালত প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। প্রথমোক্তকার্য্যের জন্য আমরা জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি। শেষোক্ত আত্মরক্ষা ব্যাপারে সেবাধর্ম্ম এদেশে বহুদিন আদৃত হইতেছে। পারস্পরিক সহায়তা, রোগে এবং শোকে উপলব্ধি হইলে, কেবল যে সাময়িক দুঃখনিরাকারণ হয়,এমন নহে. উহা সমাজবন্ধনের

দিকে এবং সামাজিক ব্যবস্থাদির প্রতি অতি-সহজেই সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করে। এজন্য তদ্‌সম্বন্ধীয় দেশের সনাতন পদ্ধতি এবং বর্ত্তমান কর্ম্মপর্য্যায় আলোচনা প্রয়োজন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি বৎসর প্রকাশিত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রাজকার্য্যের বিবরণে (Administration Report) দেখা যায়, মোটামুটি পঞ্চবিধ উপায়ে রাজশক্তি দেশের পীড়িত, রুগ্ন এবং অক্ষম সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছে।

(১) জন্ম এবং মৃত্যু রেজিষ্টারী। ইহাতে মোটামুটি স্থান বিশেষ বা প্রদেশ বিশেষের অবস্থা বোঝা যায়।

(২) ভারতের মাঝে বা বহির্ভাগে সাধারণের গমনাগমনের তালিকা। (Emigration)

(৩) ভেষজ-ব্যবস্থা—যথা স্থানে স্থানে চিকিৎসা-শিক্ষাগৃহ, দাতব্য-চিকিৎসালয়, হাঁসপাতাল, পাগলা গারদ, রসায়ন বিশ্লেষণ বিভাগ স্থাপন এবং বিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা।

(৪) স্যানিটেশন—(Sanitation)

(৫) সংক্রামক রোগাদির জন্য (Vaccinationএর ব্যবস্থা।

উপরোক্ত তালিকা তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম উপায়ে সমাজ অল্পবিস্তর অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু সে পথে একটু বাধা আছে,সেই বাধাটুকু আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বপ্রচলিত পঞ্চায়েত প্রথা প্রভৃতি ইংরাজের আগমনে পঙ্গুত্ব পাওয়ায় সমাজের ব্যবস্থা প্রভৃতির দিকে সাধারণের অবজ্ঞা জন্মিয়াছে, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, জল নির্গমের উপায় সম্বন্ধে কোন কার্য্য পরস্পরের মধ্যে স্থির হইলে যে কেহ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারে। অতটুকু অবহেলা করিবার শক্তি সমাজ অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিসাধারণকে দিয়াছে। কেবল ধর্ম্ম-সংমিশ্রিত আচারকৃত্যে, বিবাহ-শ্রাদ্ধে এবং মৃতদেহ সৎকার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমাজের সাহায্য না হইলে চলে না।

এই সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্য মূলে নানাবিধ আঘাত এবং তদুপরি সমাজশক্তির সংহতির অভাববশতঃ সমাজ আত্মশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। আংশিক শক্তি চর্চ্চায় ব্যর্থ হইয়া নিজকে একেবারে পঙ্গু মনে করিতেছে। শক্তিমানের পক্ষে নিজকে শক্তিহীন মনে করা অত্যন্ত অদ্ভুত, সন্দেহ নাই। এই কথা মায়াজ্ঞান-যুক্ত নেত্র-দৃষ্টি কি ভাবে দেশে উপস্থিত হইল—কে সমাজের এবং ব্যক্তির চক্ষে এই মদির-বিভ্রম কজ্জল অর্পণ করিল, তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়, এই সমস্ত অসুবিধা এবং অক্ষমতা স্বীকার করিয়া কি প্রকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে।

অর্থাৎ ব্যাধির মূল কারণ যদি আপাততঃ দূর করা যাইতে না পারে, তবে তজ্জন্য অপেক্ষা না করিয়া রোগের চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

ধনধান্যের অভাবে সাধারণের পক্ষে উৎকৃষ্ট পানীয়, মুক্ত-সুস্থ বায়ু, পুষ্টিজনক খাদ্য এবং পরিচ্ছন্ন পরিধেয় প্রাপ্তির সুযোগ অধিক নাই। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা হইতে যে স্বাবলম্বন এবং সুস্থ সম্মিলনের ভাবপ্রবাহ সহজভাবে জাগ্রত হইয়া উঠে, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক

জীবনের পরস্পর-প্রতিবাধী অসামঞ্জস্য তাহা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করে, এজন্য দেশকে অভি-সম্পাত-গ্রস্ত কিম্বা অজ্ঞানান্ধকারসজ্জিত এইরূপ সার্টিফিকেট দেওযাটা এক্ষেত্রে শেষ কর্ত্তব্য নহে।

হিংস্রধর্ম্মী মানব হইতে যেমন আত্মরক্ষা প্রয়োজন,রোগ ও দারিদ্র্য হইতে আত্মমুক্তির চেষ্টাও অবহেলনীয় নহে। আমরা সুস্থ, সবল, দীর্ঘকায় মানুষ চাহিলে, ইহা প্রাপ্তির পক্ষে প্রকৃতি এবং ভিন্নরাষ্ট্রীয় মানব যে সমস্ত প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অস্খলিত সঙ্কল্পে উৎপাটিত করা চাহি।

রাষ্ট্রীয় অধীনতা হইতে রোগ-তাপ-মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় যথাসম্ভব প্রতিকার চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণে পল্লী-সমাজ, পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষায় যাবতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছে না। নৈতিক শক্তির প্রভাবে ততটা শ্রদ্ধা এবং শক্তি সমাজ এখনও আত্মস্থ করিতে পারে নাই। দৈহিক শক্তি (compulsion) ব্যবহারের ক্ষমতাও তাহার নাই। কিন্তু এই মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়ও একেবারে যে সমাজ শক্তিহীন নহে, তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

এই প্রবন্ধে জলরক্ষা, কূপ-তড়াগ প্রভৃতির ব্যবস্থা, আবর্জ্জনা, পশুপালন, গোময় প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্য্যাকার্য্য, রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালী, বায়ুর মুক্তগতি, স্বাস্থ্য-কর-গৃহনির্ম্মাণ করা, ভূশয্যা ও মঞ্চশয্যার বিচার, মৃতদেহ সৎকার, সংক্রামক রোগ প্রাদুর্ভাবে সাবধানতা এবং নিবারণ চেষ্টা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনার স্থান নাই। রাস্তার বা হাট প্রভৃতি নিয়মিত করা বা অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বাণিজ্যাদি নিরুদ্ধ করা বিষয়ে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

নব্যরাষ্ট্রের ভেষজব্যবস্থা এবং ভেষজ-সাহিত্য আলোচনা কিরূপ গুরুতর ব্যাপার এবং এই জ্ঞান বিভাগকে এই নবযুগে কি ভাবে মুক্ত এবং ফুল্ল করা প্রয়োজন, তাহা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভেষজ-প্রয়োগ যখন সমাজে প্রচলিত আছে, তখন তদ্বিষয়ক সাহিত্য-চর্চ্চা একান্ত প্রয়োজনীয়, সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি পল্লীরাজ্যেই হউক বা অন্যত্রই হউক, চিকিৎসা শাস্ত্রটী এত অবজ্ঞাত যে, উহার উপর আস্থা স্থাপন করা একান্ত দুষ্কর। প্রচুর পরিমাণে মন্ত্রতন্ত্র, সিদ্ধকবচ, রহস্যজনক ফুৎকার প্রভৃতির শৃঙ্খলাহীন আতিশয্য দেখিয়া মাঝে মাঝে ধিক্কার দেও-য়ার প্রবৃত্তি জন্মে। তদুপরি টোট্‌কা ঔষধ, "মুষ্টিযোগ" তন্ত্রোক্ত নানাবিধ অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির প্রাদুর্ভাবও কম নহে। এক একটী গ্রাম্য কবিরাজের বা মন্ত্রবিদ্ ফকিরের হাতে সহস্র সহস্র জীবন নির্ভর করে। নিতান্ত নিয়তির উপর স্থির বিশ্বাস থাকাতে ইহার প্রতিকার কিম্বা এতদ্সম্বন্ধে সমগ্র দেশময় আলোচনা বা আন্দোলন হইয়া উঠে নাই।

প্রাচ্যরাজ্য একান্ত কল্পনাপ্রিয়। লৌকিক ব্যবস্থার শুষ্ক নিগড়ে প্রাচ্য হৃদয় ভূয়িষ্ঠ পরিমাণে ধরা দেয় নাই। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার আলোচনায় তাহার উৎ-সাহ অধিক, কারণ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান কল্পনার ততটা অবসর দেয় না। একটু প্রাচুর্য্য, একটু আতিশয্য,একটু অত্যুক্তি সে আদর কায়দার অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করে। আরব্যোপ-ন্যাস্ পঞ্চতন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতির উপাখ্যান

হইতে সহজেই সরল উদার প্রাচ্য-হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া উঠে।

ফরাসী মনীষী August Comte জ্ঞান-জগতের যে তিনটী ক্রমাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার শেষ অবস্থা অর্থাৎ positive state প্রাচ্য-হৃদয় পছন্দ করে না।

কেহ যেন মনে না করেন, Comteএর শ্রেণীপর্য্যায়ের ক্রমকে আমি এতৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত classification মনে করিতেছি।* ইচ্ছামত শ্রেণীপর্য্যায় নির্ণয় করিলেই উহা চরম সত্য হইল না। কাজেই positive state অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অবস্থা আর নাই—কিম্বা উহাই গৌরব করিবার ব্যাপার, ইহা আমি মনে করি না। জ্ঞান-জগতের মাঝে ক্রমস্ফূর্ত্তির চক্র (cycle) আছে, ইউরোপ হয়ত যে positive ষ্টেটকে লইয়া করতালি দিতেছে, তাহার ক্ষুদ্রতার দৈন্য হয়ত তৎসঙ্গে উপলব্ধি হইতেছে না।

তুলনায় সমালোচনার জন্য আমার positive state বিষয়ে উল্লেখ করিবার প্রবৃত্তি হয় নাই। শুধু সেই অবস্থাটী উপলব্ধির জন্যই উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ যে সমস্ত শাস্ত্রশিক্ষার যে প্রণালী এবং মানসিক গতি প্রয়োজন, তাহার প্রতি উদাসীন হওয়া চলেনা। কাজেই ভেষজ বিদ্যাচর্চ্চায় যদি কাহারও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান এবং বিচারশক্তির প্রতি অবহেলা জন্মে এবং তৎসঙ্গে অতীন্দ্রিয় ব্যাপারের দিকে মন প্রধাবিত হয়, তবে তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক করিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

সংক্ষেপতঃ এই বিদ্যার মূলে observation, experiment এবং verification প্রয়োজন। যাহাতে সম্যক্‌রূপে এই ত্রিবিধ ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, তৎপ্রতি যত্নবান থাকা প্রয়োজন।

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশে ত্রিবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিষ্প্রয়োজন এবং সাধ্যায়ত্তও নহে। তবে কোন্ প্রণালীর চিকিৎসা বহু-বিস্তৃত এবং কোন প্রণালীর কি কি সুবিধা অসুবিধা আছে, কিম্বা শিক্ষাবিস্তৃতির পথ সুবিধাজনক, তাহার বিচার প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয়, চিকিৎসকের তালিকা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য, অথচ এমন গ্রাম নাই, যেখানে দু'চার জন চিকিৎসক নাই।

ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথী নামক দুইটী চিকিৎসা-পদ্ধতি বর্ত্তমানে দেশে অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাদের ব্যবহার পৃথিবী-বিস্তৃত শত শত পাব্‌লিক এবং প্রাইভেট হাঁসপাতালে, জগতের সর্ব্বত্র এই প্রণালীদ্বয়ের চিকিৎসা চলিতেছে। প্রতিদিন সহস্র সহস্র স্থান হইতে এই প্রণালীর ভেষজের পরীক্ষা হইতেছে। পীড়িতের অবস্থা বিবেচনা, কতটুকু পরিমাণ ঔষধ কি উপকার করিল, অন্যান্য কি কি ভেষজমিশ্রণে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিল, এতৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া মুক্তজ্ঞানের খরতর আলোকে বিচার হইতেছে।

প্রত্যেক দৈনন্দিন ঘটনা, ফলাফল, নূতন উপায় প্রভৃতি সহস্র চিকিৎসক, গ্রন্থরূপে বা সাময়িক পত্ররূপে, লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফলতঃ observation, experiment প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে অহরহ চলিতেছে, কোন লুকোচুরি ব্যাপার নাই, গোপ্য বা গোপন বিষয়

* হার্বার্ট স্পেন্সার মহোদয়ের Genesis of Science নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কিছু নাই। চিকিৎসকের কৃতিত্ব প্রদর্শনের বিশেষ সুবিধা থাকিলেও কোন জ্ঞান তাহার বক্ষপঞ্জরে লুক্কায়িত নহে। একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের মৃত্যুতে তেমন হাহাকার করিতে হয় না—কারণ তাঁহার জ্ঞান অধিকাংশ অবস্থায় তিনি গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

এই দুইটী পদ্ধতি সম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার নাই।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভারতীয় পদ্ধতি দেশে প্রচলিত নাই, একথা কিছুতেই বলা যায় না। বরং আমাদের যতই পল্লীর অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই দেখিতেছি,মোটামুটী আয়ুর্ব্বেদ-প্রণালীর প্রচার বিস্ময়জনক, এমন কি, হয়ত পূর্ব্বোক্ত দুইটী পদ্ধতি অপেক্ষা ইহা অধিক আদৃত হইতেছে। গ্রামে এলোপ্যাথ থাকুক না থাকুক, কবিরাজের অভাব নাই। এবং এই সমস্ত কবিরাজের খেয়ালের উপর বাঙ্গালার সাতকোটীর জীবন নির্ভর করিতেছে। ইহা আমাদের সভ্যতার বা গৌরবের নিদর্শন নহে।

কেহ যেন মনে না করেন, এই শ্রেণীর চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতি অশ্রদ্ধাবশতঃ আমি কিছু বলিতেছি। কিন্তু শ্রদ্ধা জন্মাইবার বহু পন্থা থাকা সত্বেও তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই কেন?

যে সমস্ত উদ্ভিদ্ হইতে ভারতবর্ষ ভেষজ-সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। ইতি-মধ্যেই অনেক ভেষজ ইউরোপে অম্লানবদনে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতে উচ্ছ্বসিত হইলে চলিবে না।

চরক প্রভৃতি প্রাচীন মনীষীগণ পত্র-শিকড়ের যে যে গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, —তাহার সম্যক্ পরীক্ষা কিম্বা ঔষধের তারতম্য হিসাবে ও ফল-বিভিন্নতা বিষয়ে কোন পরীক্ষা হইতেছে কি? আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রণালীর পরীক্ষা এবং সম্যক্ চর্চ্চার জন্য বাঙ্গালা-দেশে কিম্বা ভারতে একটী হাঁসপাতালও কি আছে?

ইতিহাসে দেখা যায়, নৃপতি অশোকই প্রথম এদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হাঁসপাতাল স্থাপন করেন। হাণ্টার বলেন :—

"The best era of Indian medicines was contemporary with the ascendency of Bhuddhism(250 B.C. to 600 A.D.) and did not long survive it. The science was studied in the chief centres of Bhuddist civilisation such as the great monastic University of Nalanda near Gaya. The very ancient Brahmans may have derived the rudiments of anatomy from the direction of the sacrifice. But the public hospitals which the Bhuddhist princes established in every city were probably the true schools of Indian medicine. A large number of cases were collected in them for continuous observation and treatment, and they supplied opportunities for the study of disease similar to those which the Greek Physicians obtained at their hospital camps around the mineral springs."

ঐতিহাসিক আরও বলেন,—

"As Bhuddhism passed into modern Hinduism (600--1000 A.D.) and the shackles of caste were re-imposed with an iron rigour, the Brahmans more scrupulously avoided contact with blood or morbid matter......The abolition of the public hospitals on the downfall of Bhuddhism must also have proved a great loss to Indian medicine. The series of Mahomedan conquests commencing in 1000 A.D. brought in a new school of foreign physicians who derived their knowledge from Arabic translations of the

Sanskrit medical works of the best period These Musalman doctors or Hakims monopolized the patronage of the Mahomedan prince and nobles of India The decline of Hindu medicine went on until it has sunk into the hands of the village Kabiraj, whose knowledge consists of jumbled fragments of the Sanskrit texts and a by no means contemptible Pharmacopoiea supplemented by spells, fasts and quakery."

হাঁসপাতাল প্রভৃতিতে রোগ-পরীক্ষা, ঔষধ প্রয়োগ প্রভৃতির ধারাবাহিক চেষ্টা হইতে পাবে। সেভাবে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে যাবতীয় জ্ঞান সঞ্চিত থাকে।

ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র হাঁসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে এবং মনীষী চিকিৎসকগণ দিবারাত্র ভৈষজ সমূহের গুণাগুণ পরীক্ষায় ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, এমন আশা সহসা করি না।

হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে প্রতিবন্ধক থাকিলেও ভেষজ-পরীক্ষা স্থগিত থাকার কোন কারণ নাই। অনেক কৃতী চিকিৎসক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের চিকিৎসা-লব্ধ যাবতীয় অর্থ অত্যুচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ-কল্পে আকাশে উড্ডীয়মান হওয়া শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মনে না করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, ভেষজের ফলাফল সম্বন্ধে পরীক্ষায় ঐ অর্থ নিযুক্ত করিতে পারেন। ইহা হাওয়ায় টাকা নিক্ষেপ করা অপেক্ষা, বোধ হয়, শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য স্বীকার করিবেন।

ইউরোপ এবং আমেরিকার ভেষজের পরিমাণ-গত ফলবিপর্য্যয়ের ভারতবর্ষে পরীক্ষা মাত্র হইয়াছে, এমন নহে। উৎকৃষ্ট রাসায়নিকগণ বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক ভেষজ-বিশ্লেষণে অকরুহ নিমগ্ন আছেন, ভেষজের তীব্রতা বা মৃদুতা, নির্ম্মলতা বা বিমিশ্রণ, পরিশুদ্ধি বা ভিন্ন পদার্থের সহিত উৎকৃষ্ট উপায়ে সংযোজ প্রভৃতি প্রাত্যহিক পর্য্যালোচনার বিষয়। তাহা গ্রন্থাকারে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া সন্দেহ দূর করিতেছে।

স্থূলতঃ ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিকে empirical অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া যথাসম্ভব বিজ্ঞানমূলক করা প্রয়োজন। এজন্য সর্ব্বপ্রথম একটা উৎকৃষ্ট pharmacopoeia নব্যভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে যেন প্রত্যেক ভেষজের নবীনভাবে পরীক্ষিত গুণাগুণ থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে সংখ্যাহীন উদ্ভিদ মূল, পত্র লতা, ফল, ফুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। একখানি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হাতে লইয়া পারিভাষিক সংজ্ঞার অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নাম দেখিতেছি :—ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিজাত, চাতুর্জাত, চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চকোল, ষড়ূষণ, চতুরম্ল প্রভৃতি। এক একটীতে অনেক পদার্থ আছে।

'যেমন পঞ্চকোল' বলিলে পিপুল, পিপলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, এই পাঁচটী দ্রব্যকে বুঝায়। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্বতন্ত্রতঃ প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণগত ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে অবিরত পরীক্ষা হইতেছে কৈ? শুধু সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ হইলেই উহা শেষ প্রমাণ হইল না।

তেমনি prescription প্রভৃতির মাঝেও কোন কার্য্যকারণ ভেদ বোঝা দরকার। পুস্তকে আছে, অতএব এই ঔষধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ইহা ছাড়া জ্ঞান অধিক দূর উদার ও বিস্তৃত নহে। এই অবস্থায় আস্থা স্থাপন বড়ই দুরূহ, অন্ততঃ আস্থা স্থাপনের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

এমত অবস্থায় একটা রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করা একান্ত অবশ্য-কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাঁসপাতাল স্থাপনের কল্পনা কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিলেও, অন্যান্য অনেক উপায়ে সুস্থ জ্ঞান বিস্তার করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক আছেন, অনেকে এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য কৃতিত্বও দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান মুদ্রিত বা লিপিবদ্ধ হইতেছে কৈ? যাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বক্ষ হইতে সহস্র সহস্র মুদ্রা আহরণ করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট দেশ কি এ সামান্য প্রতিদানটুকু দাবী করিতে পারেনা? দ্বিতল বা ত্রিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ ছাড়া দেশের মাঝে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-ভার কি নিতান্ত কম?

বাঙ্গালা দেশের প্রতি জেলায় অনেক উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক আছেন। পরস্পরের মাঝে কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকায়, অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনেক উৎকৃষ্ট তথ্য বিস্মৃতির গর্ভে প্রোথিত হইতেছে। অর্থ-লোলুপ অধিকাংশ লোকই নিজের গৃহমাঝে মুদ্রাবৃষ্টির স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে ব্যস্ত—যে কার্য্যে ত্যাগ আছে, সাধনা প্রয়োজন, যাহার জন্য দুএকজনকে আত্মহারা হইতে হয়, এমন কার্য্যের সাধক কৈ? সাধন না থাকিলে ব্রতপালন কি করিয়া হইবে?

আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি আমাদের দেশে আছে বলিয়াই আমাদের এই মনোব্যথা এবং ইহার বিস্তৃতি ও প্রচার অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা কম নহে বলিয়া, এক্ষেত্রে সাধারণের মনসংযোগ একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ চুপ থাকিলে হানি নাই।

পূর্ব্বে হাঁসপাতাল এবং রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপনের কথা বলিয়াছি।

কিন্তু এক্ষেত্রে আরও কয়েকটী গুরুতর কার্য্য আছে। স্থূলতঃ আয়ুর্ব্বেদ পদ্ধতিকে শ্রদ্ধার ব্যাপারে পরিণত করিতে নিম্নলিখিত কার্য্যক্রম অবিলম্বে স্বীকার করা প্রয়োজন।

(১) প্রতি জেলায় একটী কিম্বা অন্ততঃ কলিকাতায় একটী হাঁসপাতাল স্থাপন।

(২) কলিকাতায় এবং সম্ভব হইলে প্রতি জেলায় একটী আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(৩) একটী রাসায়নাগার প্রতিষ্ঠা।

(৪) একটী আয়ুর্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদরাজ্যের Botanic garden

(৫) নূতন প্রণালীতে ঔষধ তৈয়ারের কারখানা।

(৬) গ্রন্থমুদ্রনের ব্যবস্থা। ইহাতে নব-রচিত Pharmacopœia এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ বর্ত্তমান পুস্তকাদি উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইবে।

(৭) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের পারস্পরিক যোগ।

ধীরে ধীরে প্রত্যেক বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিব। প্রাচীন সম্পদকে রহস্যময় অতীতের অন্ধকার হইতে পুনরায় মুক্ত জ্ঞানে রাজপথে আনয়ন করিতে হইলে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় নাই। ভারতের ভেষজের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জগতের অর্গলমুক্ত প্রাঙ্গণে পরীক্ষা সকলেরই বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই। এজন্য অধৈর্য্য ও অস্থৈর্য্য প্রকাশের চপলতা ত্যাগ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে লেখকের উপর ক্রুদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তিটাও কিঞ্চিৎ সংযত করিতে হইবে।

কলিকাতায় অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। কিন্তু সরলভাবে স্বীকার করাই ভাল, ইহাতে সাধারণের সুশিক্ষার পথ বিন্দুমাত্রও প্রশস্ত হয় নাই। অনেককে বিদ্যালয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়, ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগ অনেকের ঘটে না। আমি একজন ছাত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া একবার মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। বিদ্যালয়ে স্থান পাওয়া দূরের কথা,কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের প্রণালী অধ্যয়নের সুযোগও তাহার হইল না।

কিন্তু এ সমস্ত 'খেলো' পারিবারিক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য উপযুক্ত নহে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসকগণের মাঝে "Surgery" বা অস্ত্র-চিকিৎসা এবং Midwifery বা ধাত্রী বিদ্যা সম্বন্ধে চর্চ্চা অতি সামান্য। এজন্য সম্প্রতি অনেকে মেডিক্যাল কালেজে উপাধি সংগ্রহ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেছেন।

যদি নগরের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একত্র হইয়া একটা কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে এই সমস্ত জ্ঞান বিস্তার করেন, তবে কালেজ হইতে প্রত্যাগত শিক্ষার্থীর উপর পল্লীর সাধারণ বহু পরিমাণে অস্খলিত আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে।

বলা প্রয়োজন, বিখ্যাত এলোপ্যাথগণ কলিকাতায় College of Physicians and Surgeons নামক বিদ্যামন্দির এবং অন্যান্য শিক্ষাগার স্থাপন করিয়াছেন। নগরের অর্থশালী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ কি এইরূপ একটা কালেজ স্থাপন করিতে পারেন না? তাঁহাদের যত্নায়-গ্রথিত এইরূপ একটা বিদ্যালয় যাঁহারা প্রবেশের কি পরিমাণ উপকার করিবে, তাহা কি তাঁহাদিগকে বোঝান দরকার?

ইহাতে আরও একটী সুযোগ ঘটিবে। মফঃস্বলের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত বেতনে ইহার প্রোফেসার বা অধ্যাপক নিযুক্ত করা যাইতে পারে, ইহাতে নগর ও পল্লীর চিকিৎসকগণ সমবেত হইতে পারেন এবং নানা মঙ্গলজনক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারেন। একবার একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের নৃপতি এবং রাজন্যগণ, যাঁহারা সম্প্রতিও পৃষ্ঠপোষকতা করেন, শোনা যায়, বহুমুদ্রা দান করিয়া বিদ্যালয়কে গৌরব-শ্রী-মণ্ডিত করিতে পারেন। একজনও কি এই কার্য্যের জন্য কিছু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া চেষ্টা করিবেন?

বস্তুতঃ একটা আয়ুর্ব্বেদীয় কালেজের সম্পর্কেই একটী আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতাল, একটা রাসায়নাগার, এবং একটী আয়ুর্ব্বেদীয় Botanic garden থাকিতে পারে।

একটা কালেজকে কেন্দ্রীভূত করিয়া ধীরে ধীরে এ সমস্ত স্থাপন করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজী কালেজে যে "Botany" শিক্ষা দেওয়া হয়, ভারতের Botany তাহা অপেক্ষা অনেক ভিন্ন জিনিষ, কারণ এখানকার বিচিত্র উদ্ভিদ পত্র, লতা, তৃণগুল্ম অন্যত্র সুলভ নহে, এজন্য শিক্ষার্থীদের ভারতের উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রচর্চ্চা একান্ত প্রয়োজন।

কালেজ স্থাপনের আরও প্রয়োজনীয়তা আছে। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হওয়ায় পরিষদের নির্দ্ধারিত syllabus মতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় পুস্তক-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় কালেজ স্থাপিত হইলে, এইরূপ কয়েকখানি

উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনার সুবিধা হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, বর্ত্তমান সময়ে শুধু চরক-সুশ্রুতের অনুবাদ পড়িলে চলিবে না, উহার অনুবাদে তেমন বাহবা পাওয়ার কিছুই নাই। নূতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে হস্তক্ষেপণ করিতে হইবে।

কালেজের সংযোগে যে হাঁসপাতাল ও উদ্যান থাকিবে, ছাত্রগণ তথায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। অবশ্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের সাহচর্য্যে থাকার পথ ইহাতে নিরুদ্ধ হইবে না। কারণ ব্যক্তিগত শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনা নাই।

রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধেও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ অনভিজ্ঞ। তাহাদিগকে এবং শিক্ষার্থীগণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগতের রসায়নচর্চ্চা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। রসায়ন শাস্ত্রের সাহায্যে সম্প্রতি ভেষজের নির্ম্মলতা এবং প্রখরতা বর্দ্ধিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রণালীতে ঔষধ প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ এসম্বন্ধে স্থূলতঃ কলিকাতার Bengal Chemical and Pharmaceutical works কে আদর্শ করিয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিতে পারেন। বিদ্যার্থীগণ এইস্থানে ভেষজ-নির্ম্মাণ প্রণালী অধ্যয়ন করিতে পারি[illegible]। সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ প্রভৃতি [illegible] অবহেলার সহিত প্রস্তুত হয়, ইহ[illegible] বোধ হয়, অস্বীকার্য্য নহে।

এই সমস্ত প্রণালী অবলম্বিত হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় পদ্ধতির সবলতা এবং দুর্ব্বলতা ধীরে ধীরে ধরা পড়িবে। ক্রমশঃ উড্ডীয়মান জ্ঞানকে কেহই অবহেলা করিতে পারিবেন না এবং এতদ্ সম্বন্ধে যাবতীয় হেঁয়ালীও অন্তর্হিত হইবে।

কাজেই অবিশ্বাস বা অতি বিশ্বাস উভয়ই সংযত হইয়া একটা যথার্থ সহজ এবং সবল ধারণা সাধারণের হৃদয়পটে অঙ্কিত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান এলোপ্যাথীর কৃষ্ণ-ঘন এলোকেশের বিরাট ছায়া বা হোমিওপ্যাথীর হোমশিখার কম্পিত-কলেবর মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, শত রহস্য-জাল-জড়িত অতীত ভারতের বৈদ্যক-শাস্ত্রের বোধন-গীতি পুনরায় উপন্যাস পুরাণের কল্পনা-পুঞ্জ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

পরিশেষে আমার শেষ প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণের কোন সমিতি, ক্লাব বা কন্‌ফারেন্স অসম্ভব কি? সভ্যজগতের সর্ব্বত্র নানা চিকিৎসকগণের কন্‌ফারেন্স, কংগ্রেস্ প্রভৃতি হইতেছে। অনেকেই International Medical Congress এর নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইহার উপকারিতার সীমা নাই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ হইতে এইরূপ কন্‌ফারেন্সে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া এতদ্ সম্বন্ধে নানা জল্পনা কল্পনা করিতে পারেন। ইহাতে এই শাস্ত্রের ভারতব্যাপী চর্চ্চার সুবিধা হইবে। প্রত্যেক প্রদেশে যদি উপরোক্ত প্রণালীতে একখানি কালেজ, একটী হাঁসপাতাল, একটী রাসায়নাগার এবং অন্ততঃ একটী বোটানিক গার্ডেন (Botanic garden) স্থাপিত হয়, তবে, জ্ঞান-বিস্তৃতির পথ সহজ ও সরল হইবে। জনসাধারণের মঙ্গল ইচ্ছা করা হয়ত দুর্ল্লভ ব্যাপার নহে, কিন্তু পথ আবিষ্কার করাও প্রয়োজন। সেবাধর্ম্মের প্রধান কার্য্য ভেষজ ব্যবস্থা। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা, দুর্ভিক্ষ

প্রভৃতি এ দেশের নিত্য সহচরগণের সহিত কার্য্য করিতে হইলে লোক-চিকিৎসা প্রশ্ন না উঠিলে চলিবে না।

যে পর্য্যন্ত দেশে যুবক প্রচারক এবং কর্ম্মীগণ স্বয়ং চিকিৎসা বিদ্যায় কিঞ্চিৎ কৃতিত্ব লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত, যে উপকরণ দেশে আছে, তাহার শ্রেষ্ঠতা-বিধান প্রয়োজন। বর্ত্তমান সময়ে এবং ভবিষ্যতেও এদেশের ভিষক্-বৃন্দকে রাষ্ট্রকলেবরে বহু প্রধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেই হইবে, এজন্য তাঁহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর।

লোক-চিকিৎসা আলোচনায় এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথীর আলোচনার তেমন প্রয়োজন নাই; কারণ এই দুই শাস্ত্রের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত দেশে আছে। এজন্য ইহাদের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি হইতেছে।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন।

বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অধ্যায়।

(রাজীব লোচন কৃত "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র"—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এ দেশের অধিকারী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম হন এবং অন্য জাতি ও এ দেশীয় না হন তবেই মঙ্গল হয়। জগৎসেট প্রভৃতি কহিলেন এমন কে তাহা বিস্তারিয়া কহ। রাজা কহিলেন বিলাতে নিবাস জাতে ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক। এই শুনিয়া সকলেই কহিলেন তাহারদিগের কি কি গুণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহাদিগের গুণ এই এই সকল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরহিংসা করেন না যোদ্ধা অতিবড় প্রজা প্রতি যথেষ্ট দয়া এবং অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় ধনেতে কুবের তুল্য ধার্ম্মিক এবং অর্জ্জুনের ন্যায় পরাক্রম প্রজাপালনে সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠির এবং সকলে ঐক্যতাপন্ন শিষ্টের পালন দুষ্টের দমন রাজার সকল গুণ তাহারদিগের আছে অতএব যদি তাহারা এ দেশাধিকারী হন তবে সকলের নিস্তার নতুবা যবনে সকল নষ্ট করিবেক। এই কথার পর জগৎসেট কহিলেন তাহারা উত্তম বটেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি কিন্তু তাহার দিগের বাক্য আমরাও বুঝিতে পারি না ও আমাদিগের বাক্য তাহারাও বুঝিতে পারেন না ইহার পর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন এখন তাহারা কলিকাতায় কোঠি করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট নামে এক স্থান আছে তাহাতে কালী ঠাকুরাণী আছেন আমি মধ্যে মধ্যে কালী পূজার কারণ গিয়া থাকি সেই কালে কলিকাতার কোঠির যিনি বড় সাহেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকি ইহাতেই তাহার চরিত্র আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। এই কথার পর রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

কিন্তু তাহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন কলিকাতায় অনেক অনেক বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাহারা সকলে ইঙ্গরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাহারাই বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে কহিলেন ইহারা এ দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায় অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া যে সকল কথা উপস্থিত হইল এই সকল বৃত্তান্ত কোঠির বড় সাহেবের নিকট জ্ঞাত করাইবা তিনি যেমন যেমন কহেন বিস্তারিত আমারদের কহিবা এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিবেন তাহারা দেশাধিকারী হইলে আমারদিগের এ রাজ্যের প্রতুল করিবেন আর এখন যে যে কার্য্য আমারদিগের আছে ইহাতেই রাখিবেন। এই কথার পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাহারা দেশাধিকারী হইবেন রাজ্যের প্রতুল রাখিলেই রাজার প্রতুল হয় আমাদের এ কথা কহনে আবশ্যক নাই তবে যে কথা কহিলেন আপনারদিগের যে যে কার্য্য আছে ইহাতেই নিযুক্ত রাখিবেন তাহার কোন সন্দেহ মহাশয়েরা করিবেন না তাহারদিগের রাজ্য হইলেই সুখি সকল লোক হইবেক কিন্তু আপনারা আমাকে নিতান্ত স্থির করিয়া আজ্ঞা করুন। পরে সকলেই কহিলেন এই স্থির হইল আপনি কলিকাতায় গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন॥

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সাহেবের নিকট আত্ম রাজ্যের অপ্রতুল নিবেদন করিয়া রাজধানিতে বিদায় হইয়া নিজ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পরে শিব নিবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। রাজা যাবদীয় পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন আমি একবার কালীঘাটে যাইব তোমরা প্রস্তুত হও। সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া রাজ সভা হইতে আত্ম আত্ম স্থানে আসিয়া রাজার গমনের আয়োজন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ গৌণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে আসিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কোঠির বড় সাহেবের নিকট আপন পাত্রকে পাঠাইলেন আর কহিলেন তুমি সাহেবকে নিবেদন কর গিয়া আমি কল্য সাক্ষাৎ করিতে যাইব। রাজার পাত্র আসিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কালীঘাটে আসিয়াছেন এখন বাসনা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাহেব আজ্ঞা করিলেন আসিতে কহ। সাহেবের আজ্ঞা পাইয়া পাত্র রাজাকে সমভিব্যাহৃত করিয়া পরদিবস সাহেবের নিকট আনিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র সাহেব যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া বসিতে সিংহাসন দিলেন। রাজা ও সাহেব দুই জন সিংহাসনে বসিয়া অনেক অনেক হাস্য পরিহাস্য করিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অনেক শিষ্টাচার করিলেন। সাহেবের প্রধান যে চাকর তিনি উভয়েরি বাক্য বুঝাইয়া জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন। অনেক অনেক কথার পর রাজা কহিলেন আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে। সাহেব কহিলেন কি নিবেদন। রাজা মুরসদাবাদের বৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত করাইলেন আর কহিলেন এ রাজ্য আপনারা রক্ষা না করিলে যাবদীয়

লোক অত্যন্ত ব্যামোহ পায় এবং জবন অধিকারী থাকিলে সকল দেশ নষ্ট হয় এই কারণ নবাবের প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণ আপনকার নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সকল বৃত্তান্ত সাহেব শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিয়া কহিলেন আমি এ সংবাদ বিলাতে লিখি সেখানকার আজ্ঞা আনিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এ দেশ করতলে আনিয়া সকল মনুষ্যকে পরম সুখে রাখিব তুমি এই সমাচার নবাবের পাত্র মিত্রগণকে লিখহ। এবং যথেষ্ট আশ্বাস করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সাহেব সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে উপস্থিত হইয়া সকল বিস্তারিত নবাব সাহেবের প্রধান প্রধান পাত্রকে জ্ঞাত করাইলেন সকলে শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

দৈবের ঘটনা ক্রমে নবাবের বিপদ উপস্থিত হইল তাহার বৃত্তান্ত এই।

ইঙ্গরাজের বানিজ্যের কোঠি অনেক গ্রামে ছিল যে জিনিষের যে রাজকর নিয়ম ছিল সেই মত নবাব সাহেব পাইতেন। নবাব স্রাজেরদৌলা অন্তঃকরণে করিলেন ইঙ্গরাজেরা ব্যাপার বানিজ্য অতি বিস্তর করিতে লাগিলেন অতএব আমি এখন অধিক রাজকর লইব ইহাই মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া প্রধান প্রধান পাত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন সর্ব্বত্রে সম্বাদ লিখহ যেখানে২ ইঙ্গরাজের বানিজ্যের কোঠি আছে সেই ২ খানে আমার যে ২ চাকরেরা রাজকরের কারণ আছে তাহারদিগের উপর এই লিখহ যে সব নিয়ম আছে তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লয়। ইহা শুনিয়া পাত্র কহিলেন ইঙ্গরাজ সাহেবেরা বিদেশী মহাজন এ দেশে অনেক কালাবধি ব্যাপার বানিজ্য করেন নিয়মিত রাজকর বরাবর দেন কখন অধিক দেন নাই এখন আপনি অধিক লইবেন এ উত্তম পরামর্শ না তবে মহাশয় কর্ত্তা যেমত আজ্ঞা হয়। এই কথায় যাবতীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন মহারাজ মহেন্দ্র যে কহিলেন এই উত্তম আদ্যোপান্ত যে হইয়া আসিতেছে এখন তাহাতে ব্যতিক্রম করা ভাল নহে। পাত্র মিত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নবাব উষ্মান্বিত হইয়া কহিলেন তোমরা আমার চাকর আমি যেমন ২ কহিব সেই মত কার্য্য করিবা তোমারদিগের বিবেচনায় কি করে পুনরায় যদি এ বিষয়েতে কেহ বাক্য কহ তবে তাহার যথেষ্ট শাস্তি করিব। সকলে নিঃশব্দ হইলেন পরে আজ্ঞা প্রমাণ যেখানে ২ কোঠি ছিল সেই ২ খানের আমিল চাকরের প্রতি লিপি লিখিলেন অদ্যাবধি ইঙ্গরাজ সাহেব লোকেরা বানিজ্য যে করিতেছে তাহারদিগকে করের যে নিয়ম ছিল তাহা অপেক্ষা রাজকর অধিক লইবা। এই সমাচার পাইয়া নবাবের চাকরলোকেরা কোঠির চাকরেরদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইল কোঠির চাকর সমস্ত কলিকাতায় কোঠির বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিলেন সাহেব সর্ব্বত্রের পত্র পায়া সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন।

এই সময় নবাব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যের কারণ উষ্মান্বিত হইলেন কিন্তু বাহে প্রকাশ করেন নাই। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে বিবেচনা করিলেন যে নবাব সাহেব আমারদিগের উপর উষ্মা করিয়াছেন অতএব যদি আমরা এখানে থাকি তবে জাতি প্রাণ ও ধন সকল যাবেক অতএব এই সময় সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহি-

লেন নবাবের সাক্ষাতে থাকিলে এ সকলি সারিবে কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব সকল দেশ নবাবের। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই সে স্থান নবাবের অধিকার নহে ইঙ্গরাজ সাহেবেরদিগের অধিকার এবং তাহারদিগের গুণ রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায় বিস্তারিয়া কহিয়াছেন তাহাতে আমি জ্ঞাত আছি তাহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না অতএব কলিকাতায় গমন করা পরামর্শ নতুবা সকল নষ্ট হবেক। এই স্থির করিয়া সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাজা রাজবল্লভ কলিকাতায় আসিয়া কোঠির বড় সাহেবের শরণ লইয়া বিস্তারিত নিবেদন করিলেন। কোঠির সাহেব আশ্বাস করিয়া বলিলেন তোমারদিগের কোন চিন্তা নাই তুমি কলিকাতায় থাকহ। ইহাই বলিয়া আপনার প্রধান চাকরকে কহিয়া দিলেন রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নবাবের সঙ্কায় পলায়ন করিয়া আমার শরণ লইয়াছে তুমি যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া উত্তম এক স্থানে রাখহ। সাহেবের আজ্ঞা মতে প্রধান প্রধান চাকর উত্তম স্থানে রাখিলেন।

কিছুকাল গৌণে নবাব স্রাজেবদৌলা শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় গিয়া রহিয়াছে শুনিবা মাত্র অতি ক্রোধান্বিত হইয়া মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবকে এক পত্র লিখ যে আমার চাকর রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট শীঘ্র পাঠাইবে। মহা রাজা মহেন্দ্র নবাব সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া নিঃশব্দে রহিলেন ক্ষণেকের পর নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা তাহাই লিখিতেছি কিন্তু এক নিবেদন আছে কলিকাতার কোঠির যে বড় সাহেব আছেন তাহারদিগের জাতের এক নিয়ম আছে যদি কেহ শরণাগত হয় তার জন্যে আপনার প্রাণ দিলেও যদি সে রক্ষা পায় তাহাও করেন। এ কেবল তাহারদিগের নিয়ম নহে সকলেরি শাস্ত্রে এই মত আছে শরণাগত রক্ষা ধর্ম্ম আর শরণাগত ত্যাগ করিলে অধর্ম্ম কিন্তু বিশেষ তাহারদিগের পণ প্রাণ থাকিতে শরণাগত ত্যাগ করেন না অতএব নিবেদন করি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুক পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে আমি তাহাকে আনিতেছি হটাৎ এমত লিখন যদি আপনি লিখেন আর কোঠির সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন তবেই বিবাদ উপস্থিত হইবেক তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিতে আজ্ঞা করেন সেই মত কার্য্য করি। নবাব শুনিয়া অধিক ক্রোধ করিয়া কহিলেন এখনি কোঠির সাহেবকে লিখহ। পরে মহারাজ মহেন্দ্র মুনসিলোককে পত্র লিখিতে আজ্ঞা করিয়া দিলেন পত্রের বিবরণ এই॥

আত্মমঙ্গল সংবাদ লিখিয়া লিখিলেন আমার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণ দাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে অতএব ভাইজী তাহারদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন ইহাতে কদাচ অন্যমত করিবেন না। এই মত পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কোঠির বড় সাহেব লিপি পাইয়া আপন প্রধান প্রধান পাত্র মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন। চাকরেরা পত্র জ্ঞাত হইয়া সাহেবকে পত্রের অর্থ জ্ঞাত করাইলেন পত্রের

অর্থ শুনিয়া সাহেব হাস্য করিয়া আত্ম চাকরকে আজ্ঞা করিলেন পত্রের উত্তর লিখহ। নবাব সাহেবকে কলিকাতার কোঠির বড় সাহেব উত্তর লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম মঙ্গল সমাচার লিখিয়া লিখিলেন ভাই সাহেবের এক পত্র পাইয়া পরম হৃষ্ট হইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনকার চাকর রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছে তাহার কারণ এই ভাই সাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে আমার নিকট থাকিলে ইহারা ভয় হইতে মুক্ত হইবেক অতএব এ ক্ষুদ্র লোক ইহার প্রতি আপনকার ক্রোধ সে কেমন যেমন মেষের উপর সিংহের পরাক্রম অতএব আপনি এ দেশাধিকারী সকলের উপর কৃপাবলোকন করিয়া পালন করিতে উচিত হয়। ইহাতে যদ্যপি অল্প ২ অপরাধে চাকরেরদিগের উপর নিগ্রহ করেন তবে কর্ত্তার মহিমার ত্রুটি হয়। আর লিখিয়াছেন দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইতে এ বড় আশ্চর্য্য বাক্য শরণাগত জনকে ত্যাগ করিতে সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষেধ এবং আমারদিগের শাস্ত্রে ও ব্যবহারে যথেষ্ট মন্দ অতএব কিঞ্চিৎ কালের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না আমি কৌশল ক্রমে রাজবল্লভকে নিকট পাঠাইব। আর আমারদিগের বাণিজ্য এ দেশে অনেক কালাবধি আছে তাহাতে রাজকরের যে নিয়ম আছে তাহা এখন দিতেছি হটাৎ আপনকার চাকরেরা অধিক লইতে চাহে এ বিষয় আপনি আত্ম লোকেরদিগকে বারণ করিয়া দিবেন যেন অধিক না চাহে॥

নবাব সাহেব কোঠির সাহেবের পত্রের উত্তর জ্ঞাত হইয়া পাত্রমিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন কলিকাতার কোঠির সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন তাহার শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখহ পাত্র আজ্ঞা মতে পত্র লিখিলেন তাহার বিবরণ এই॥

আত্ম মঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর প্রত্যুত্তর পত্র পাইয়া সংবাদ জ্ঞাত হইলাম। লিখিয়াছেন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সে প্রমাণ বটে কিন্তু রাজাজ্ঞা পরিত্যাগ করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশী তাহাতে মহাজন দেশাধিকারির সহিত বিবাদ হয় এমত কার্য্য করা উচিত নহে অতএব আমি এ দেশের অধিকারী আমার বাক্যে যদ্যপি নিয়ম ভঙ্গ হয় তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য আপনকার সহিত যথেষ্ট প্রণয় আছে যাহাতে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এমত করিবেন। আর লিখিয়াছেন আপনকার কোঠি যেখানে ২ সেই ২ স্থানে আমার লোকে অধিক রাজ কর লইতে উদ্যত হইয়াছে। তাহার কারণ এই পুর্ব্বে যখন আপনারা এ দেশে কোঠি করিলেন তখন অল্প ২ সামিগ্রীর বানিজ্য করিলেন এখন অতিশয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন অতএব ইহাতে কি রূপে পুর্ব্বের মত রাজকর থাকে। এবং সওদাগরেরদিগেরও এই ধর্ম্ম যদি অধিক বানিজ্য হয় তবে যে দেশাধিকারী থাকে তাহাকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয় সে যে হউক। এখন রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন এবং যেখানে২ আপনকার কোঠি আছে সেই ২ কোঠিতে সমাচার লিখিবেন অধিক রাজকর দেয় বরং এখন যে হারে রাজকর দিবেন এইমত চির কাল থাকিবেক। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। দূত আসিয়া কোঠির বড় সাহেবকে পত্র দিলেক। ক্রমশঃ

বাঙ্গালীর নেতৃত্ব।

"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,আমার দেশ।'

লিখিতে বাসনা, কিন্তু ক্ষমতা অল্প, অধিকার আরো অল্প, কিন্তু ইতিহাসকে সাক্ষী করিয়া একথা না বলিলে, এদিনে, প্রত্যবায় হয় যে, এদেশের পোষ্যপুত্র মহারাজাগণ যতই বিরুদ্ধাচরণ করুন না কেন, বাঙ্গালীর ললাটে বিধাতা-নির্দ্দিষ্ট নেতৃত্বের তিলক বহু দিন হইতে শোভিত হইয়াছে। রামমোহন রায় অত্যাচারের নির্ম্মম কষাঘাতে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সর্ব্ববাদীসম্মতিতে তিনিই নব্যভারতের সর্ব্ব প্রধান উন্নতির নেতা রূপে পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। তাঁহার আগমনের বহু পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য বঙ্গের দুর্দ্দশা-কালিমা স্মরণে ব্যথিত হইয়া প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, শেষে, তাহাও প্রচুর নহে বলিয়া, বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া উৎকলে শেষ জীবন কাটাইলেন। তাঁহার স্বার্থত্যাগ, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার প্রেম, তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র-মাধুর্য্য আজ ভারতের নবজীবনের কারণ হইয়াছে। রামমোহনের পরে হরিশ্চন্দ্র, রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল মহাত্মার অভ্যুদয় হইল, কে অস্বীকার করিবে যে, তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ আজ ভারতের ঘরে ঘরে অনুসৃত হইতেছে না? তারও পরে, অক্ষয়কুমার এবং বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস এবং রাজেন্দ্রলাল একদিকে, দ্বারকানাথ এবং রমেশচন্দ্র মিত্র-যুগল অন্য দিকে; দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ ও রামতনু একদিকে, এবং মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র অন্যদিকে, অভ্যুদিত হইয়া, বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিলেন,—শুধু তাহা নহে, তাহাদের কীর্ত্তিকাহিনীতে ভারত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপর আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-যুগল, শিশিরকুমার এবং মনোমোহন ঘোষ-যুগল, এই বঙ্গে স্বদেশ-প্রেমের স্বর্গীয় সুষমা অদম্য তেজে প্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিমণ্ডিত হইলেন। তৎপর বিপিনচন্দ্র এবং আরো কত কত মহাত্মা ঐ সুরে সুর মিলাইয়া বঙ্গে অবতরণ করিলেন। এই শেষোক্ত মহাত্মাদের মধ্যে কেহ কখনও মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, বা ভীত হন নাই, একথা আমরা বলিতে পারি না। বলিতে পারি না যে, তাঁহারা সকলেই দেশের জন্য সর্ব্ব প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একথা বলিবার সময় সঙ্কোচের কোন কারণ নাই যে, বাঙ্গালীই নব্যভারতের নব-জাগরণের মূল। বাঙ্গালীর দায়িত্ব কত গভীর এবং বিস্তৃত, তাই, তুমি স্থির চিত্তে, এই দুর্দ্দিনে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।

এই সকল কথা লিখিবার সময়, আমরা বাঙ্গালী, আমাদের দোষ ত্রুটী স্মরণ করিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইতেছি। সঙ্কুচিত হইতেছি—যে জাতির মধ্যে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন;—যে জাতির মধ্যে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীন-চিন্তার জন্য অতুল যশো-মণ্ডিত হইয়াছিলেন, বলিতে কি, যে জাতির মধ্যে "বন্দেমাতরম মন্ত্রের"—আবি-

কর্ত্তা, মহাসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় স্বাধীনতার পুরোহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জাতির মধ্যেই কত স্বদেশদ্রোহী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে! ব্রাহ্মণ বংশ ভারতের চির পূজ্য শ্রেষ্ঠবংশ, এই দেব-বংশে আজ কাল যে সকল কুলাঙ্গারের জন্ম হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে লজ্জায় বাঙ্গালীর মুখ মলিন হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া, সেটা, তুমি কখনও মনে করিও না, শতাব্দী-ব্যাপী বাঙ্গালীর নেতৃত্ব তুমি অধিকার করিতে পারিবে। তুমি যত বড়ই হও না কেন, বাঙ্গালী মহাজন-দিগের কথা ভাবিবার সময় একটু ভক্তি এবং সম্মানের সেবা করিও। মনে রাখিও, তোমার এবং তিলকের, তেলাঙ্গ এবং অযোধ্যা-প্রসাদের বহু পূর্ব্বে, রামমোহনের অভ্যুদয়, এই বঙ্গে হইয়াছিল। আর তুমি ইংরাজ, তুমি যত বড় ক্ষমতাশালীই হও না কেন, এই পুণ্যভূমি বঙ্গের কথা ভাবিবার সময়, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিম-চন্দ্রের কথা নিভৃতে এক একবার ভাবিও। শত শত-বৎসর-ব্যাপী তপস্যার ফলে বঙ্গ আজ বহু রত্নের অধিকারী—এহেন বঙ্গকে উপেক্ষা করিবার সময় একটু একটু একটু ভাবিও। আমাদের কোন সম্বল নাই, বলিতে কি, কিছুই নাই, কিন্তু, কিন্তু ভাবিও,—কত কত ঋষিপ্রতিম ব্যক্তির পূত চরণ-ধূলি এই বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিয়াছে। এ জগতে কোন সত্য যেমন কখনও বিনষ্ট হয় নাই, তেমনি, কোন মহাত্মার জীবন-ধারণ বা জীবন-পাত ব্যর্থ হয় নাই—অণু পরমাণুতে মিশিয়া বংশানুক্রমে তাহা জাতির মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। তোমাদের দেশে এক জনও শ্রীচৈতন্য বা রামমোহনের ন্যায় লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই,—কেন বৃথা আস্ফালন কর,—কেন বৃথা অহঙ্কার কর? মনে রাখিও, বঙ্গ অজেয় পুণ্য-সাধনা-বলে অটল এবং নির্ভীক—কোটী কোটী বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের ফলে, মাতৃজাতির বুকের পুণ্যরক্তে, এই সাধক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মনে রাখিও, বাহু বলে নয়, রক্তপাত দ্বারা নয়, এই বাঙ্গালী জাতি কেবল নীতি, পুণ্য ও প্রতিভার সাধনা-বলে এই ভারতের নেতৃত্ব পাইয়াছে। যদি ধর্ম্ম এবং চরিত্র, পবিত্রতা এবং সংযম এই জাতির একমাত্র সাধনার বিষয় থাকে, নিশ্চয় জানিও, এই বাঙ্গালীর নেতৃত্ব কিছুতেই যাইবে না—বংশানুক্রমে ভারতের ঘরে ঘরে তাহা সংক্রা-মিত হইবে। আজ ভাই, জরা-মরণময় সংসারে, অমৃতত্বের আহ্বানে, আকাশ কাঁপাইয়া বল, জয় বাঙ্গালীর জয়।

আজ নানা দুশ্চিন্তায় আমরা সর্ব্বদা চক্ষের জলে ভাসিতেছি। উমেশচন্দ্র, আনন্দ মোহন, রমাকান্ত, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব স্বর্গে গিয়াছেন, অবশেষে, হায়, স্বদেশ-প্রেমিক মহা-রাজা সূর্য্যকান্তও আজ স্বর্গে;—বিপিনচন্দ্র আজ বিদেশে, সুরেন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যে প্রপীড়িত, —কত শত কথা ভাবিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি। যে দিকে তাকাই—কেবল নির্য্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, হায়, কত কত চিন্তায় আজ আমরা ম্রিয়মাণ। কিন্তু বিধাতার ইঙ্গিত কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—তিনি সদা শয়নে, স্বপনে, জাগরণে বলিতেছেন,—"ভয় নাই, বাঙ্গালীর নেতৃত্ব নিশ্চয় অক্ষয় হইবে।" ভাইর কাছে ভাই, আজ দুঃখ বিপদে, মায়ের নাম স্মরণ করিয়া, প্রাণ বাঁধিয়া, একবার দাঁড়াও। এই চির-দরিদ্র দেশের একমাত্র রক্ষার উপায় "স্বদেশী-মন্ত্র", ভাই পায়ে ধরি, কিছুতেই এই মন্ত্র পরিত্যাগ করিও না। যাহারা স্বার্থসিদ্ধির

জন্য বিপথে চালাইতে চায়, সেই পোষ্যপুত্র পা-চাটা-গোলামদের কথা শুনিও না। কত কত কারখানা উঠিয়া গিয়াছে, কত কত ব্যবসা মাটী হইয়াছে, কত কত লোক নিরন্ন হইয়াছে, কত কোটী কোটী লোক চক্ষের জলে ভাসিতেছে, একবার ধীর চিত্তে ভাব। ভাবিয়া, বুকে হাত দিয়া বলত, আর কি বিদেশী-দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত? রসনাকে সংযত কর, ব্যবহারকে সংযত কর, জীবনকে সংযত কর। "সংযম" ভিন্ন কেহ এ সংসারে কখনও ধর্ম্ম পায় নাই। ধর্ম্ম ভিন্ন কেহ কখনও নৈতিক বল পায় নাই। নৈতিক বল ভিন্ন কেহ কখনও মনুষ্যত্ব পায় নাই। মনুষ্যত্ব ভিন্ন কেহ কখনও "নেতৃত্ব" পায় নাই। যদি বাঙ্গালীর "নেতৃত্ব"কে অক্ষুণ্ণ-রাখিতে চাও, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থকে "স্বদেশী-মন্ত্র"-সাধন-ক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দেও, এবং নীলকরদিগের অত্যাচার-প্রপীড়িত কৃষকগণ যেমন বলিয়াছিল, "এ হাতে আর নীল বুনিব না," তেমনি, প্রতিজ্ঞা কর, "এ হাতে আর বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করিব না।" দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞায় দেশ কাঁপিয়া উঠুক,—মেটার দল বুঝুক যে, বাঙ্গালীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা কখনও টলিবে না। নিশ্চয় জানিও, এমন একদিন আসিবে, যেদিন মেটার দল পরাস্ত হইবে এবং "স্বদেশী মন্ত্রে," পূর্ণরূপে, ভারত দীক্ষিত হইবে। বাঙ্গালীর নেতৃত্ব অটুট থাকিলে, সোণার ভারত বাঙ্গালীর অনুসরণ না করিয়া কোথায় যাইবে? একদিন, নিশ্চয়, ভারত—"দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ"-মন্ত্রে পূর্ণরূপে দীক্ষিত হইবে। নিশ্চয় জানিও, একদিন "বন্দে মাতরম" মন্ত্রের জয় হইবেই হইবে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৬। শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী কৃত পূর্ণ সাধনা।—স্বামীজির দীর্ঘকাল-সাধনা-প্রসূত অমূল্য উপদেশ পাঠে আমরা সুখী হইলাম।

১৭। রাখীবন্ধন।—শ্রীঅনাথবন্ধু সেন প্রণীত, মূল্য /১০। পুস্তকখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। একটী কবিতার একটু উদ্ধৃত করিলাম।

"মায়ের প্রসাদী রাখী, আয় হাতে আয়,
বেঁধে রাখি তোরে আমি অসীম মায়ায়!
তোমারে করিয়া পূজা পূজিব সে দশভূজা,
জ্ঞান-কর্ম্ম-ধর্ম্মরূপা দেবী অন্নদায়!
আজি হেথা দীক্ষা লবো, পবিত্র, সুন্দর হবো,
পাব সঞ্জীবনী শক্তি বাঙ্গালী হিয়ায়!
নিত্য এ কুটীর-কোণে সমাদরে, সঙ্গোপনে,
পিয়াবি অমৃত-কণা অতুল কৃপায়!
মায়ের প্রসাদী রাখী আয় হাতে আয়!
বাঁধিলাম পুণ্য রাখী—জয় ভগবান!
এবার সফল কর বাঙ্গালীর প্রাণ!
বিশ্বের আদর্শ ধর্ম্মে জাগি যেন জ্ঞান-কর্ম্মে,
পরার্থে করিহে যেন আত্ম বলিদান!
জননী-জনমভূমি স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ তুমি!
সর্ব্বোপরি আছ দেব পূর্ণ ভগবান!
স্মরি' স্নেহময়ী মায়, মাতৃ জ্যোতি-মহিমায়
পুণ্যবলে ধরাতলে বাড়াই সম্মান!
ভূমানন্দে জাগো প্রাণে পূর্ণ ভগবান!
তুমি পূর্ণ ভগবান!"

কি সুন্দর!

১৮। তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত।—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০। তিলকের চিত্র এবং হস্তাক্ষর সম্বলিত। ১৬ পেজ ডবল ক্রাউন ১২০ পৃষ্ঠায় পুস্তক পরিসমাপ্ত। মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহামতি তিলকের নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতে অস্বীকৃত হওযায়, দেউস্কর মহাশয়কে, হিতবাদীর সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এতদ্দিন পর এই দুঃখ দূর হইয়াছে, তিলকের প্রতি গ্রন্থকারের অকৃত্রিম অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশের উপযুক্ত অবসর মিলিয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে সখারামের গভীর স্বদেশানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

দেউস্কর মহাশয়ের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত। তাঁহার আদর্শ জীবন বঙ্গের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইতেছে, ইহা ভাবিলেও আমরা গৌরবান্বিত হই। এই এক দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হয় যে, বাঙ্গালীর সহিত অচিরে ভারতের সকল জাতির একতা হইবে। দেউস্কর মহাশয়কে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের জন্য, প্রণাম করিতেছি।

এই সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। দেউস্করের লেখনীতে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হউক।

গ্রন্থখানিতে মহামতি তিলকের মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আশা করি, প্রত্যেকে ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া তিলক-প্রীতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরিশেষে অতি দুঃখের সহিত লিখিতেছি, পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে মুদ্রিত। কাগজের এজেণ্ট শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "বলিব কি, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজের কথা দূরে থাকুক, উইক্‌লি নোটিস্ প্রভৃতিও বিলাতী কাগজে ছাপা হয়।" বাস্তবিক এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। "মুখে এক, কাজে আর এক"—এই ভাব দূর না হইলে এদেশের মঙ্গল হইবে না। দেশের নেতাগণের ব্যবহারেই বুঝি বা "স্বদেশী" পণ্ড হয়।

১৯। নূরজাহান। নাটক। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য ১৲।

দুর্গাদাস যে হাত হইতে বাহির হইয়াছে, ইহাও সেই হাতের লেখা। গ্রন্থকারের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে।

মহবৎ খাঁর জীবনী এক আশ্চর্য্য জিনিস। মহাবৎ খাঁ যখন জাহাঙ্গীরকে বলিতেছেন—"কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি স্বত্বে আপনি এক অতি পুরাতন সভ্যজাতিকে শাসন কর্ত্তে বসেছেন—যদি সে ন্যায়ের শাসন না হয়? হিন্দু এ সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কারণ তার আশা ভরসা এখানে নয়, (উর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐখানে। সে ইহকাল হারিয়েছে, পরকালের বিষয়ে বড় অধিক ভেবে। তবু জানবেন সম্রাট—যে, যদি এ শাসন অন্যায়ের শাসন হয়, যদি এ শাসন একটা বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ঔদাসীন্যকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন ত নিমিষে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মত বিলীন হয়ে যাবে।"—তখন মনে হয়, মহবৎ খাঁ মানুষ নন্, দেবতা। এই দেবতার চিত্র যেভাবে গ্রন্থকার চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে গ্রন্থকারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়।

এই মহাবৎ খাঁ সম্বন্ধে যখন কর্ণসিংহ (মেবারের রাণা) বলিতেছেন—"যখন মনে হয় যে, মহাবৎখাঁর মত ধর্ম্মভীরু কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটি কতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন করে' নিতে পারি না, তখনই বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হ'য়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিস টেনে নিজের করে' নেয়। আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হয়ে নিজেই গলে' খসে' পড়ে। আমাদের এই মহাবৎকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি—আর আপনারা আপন করে' নিয়েছেন। তাই আপনারা উঠছেন, আর আমরা পড়ছি।"—তখন মনে হয়, একজন, স্বদেশ-ভক্ত লোকও যখন এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন জাতিভেদের শৃঙ্খল অচিরে ছিন্ন হইবে এবং স্বদেশ-প্রেমে "সব ভাই একঠাঁই হইবে।"

এই গ্রন্থখানি দুর্গাদাসের সমতুল্য না হইলেও, অযোগ্য নয়। আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া যারপর নাই সুখী হইয়াছি।

২০। ভুতুড়ে কাণ্ড। শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায, মূল্য ।৵০। আদ্যন্ত পড়িলাম। আমরা এ সকল কাহিনী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। বহুদিন আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, যে সকল লোক চক্রে বসেন, তাহাদের "জ্ঞাত কথাই" বাহির হইয়া থাকে। "মেস্‌রিজম"আমরা স্বীকার করি,"উইল পাওয়ার" অন্যে সংক্রামিত হয়, জানি; কিন্তু এ সব ভুতুড়ে কথা বিশ্বাস করি না। বিশেষতঃ তথা-কথিত প্রেতাত্মারাও যখন এরূপ করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়া থাকেন, তখন এরূপ চর্চ্চায় সময় ক্ষেপণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। পুস্তকের লেখা ও ছাপা ভাল। কিন্তু কাগজ—ঐ বিলাতী। হায়রে হায়!!

২১। বাল গঙ্গাধর তিলক। (সংক্ষিপ্ত জীবনী) মূল্য ৵০। এই সময়োপযোগী সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম।

২২। মায়ের গান। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য /০ হিসাবে। অনেক ভাল ভাল লোকের ভাল ভাল গান এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২৩। স্বদেশী পল্লী-সঙ্গীত। চতুর্থ সংস্করণ। মূল্য ।১০। পূর্ব্ব বঙ্গের ভাষায় অনেক সুমিষ্ট গান এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪। বঙ্গলক্ষ্মীর পাঁচালী। মূল্য /০। এই পুস্তকের কবিতা কয়েকটী প্রত্যেকের কণ্ঠস্থ করা উচিত। সুন্দর পুস্তক। একটু তুলিয়া দিলাম -

হায় মাতঃ বঙ্গ ভূমি, কি দুঃখ পেয়েছ তুমি,
কিসে হবে এ দুঃখ মোচন।
পরাণ ত্যজিলে হায়, যদি দুঃখ ঘুচে যায়,
এ পরাণ দিব বিসর্জ্জন॥
এত দিন ঘুম ঘোরে দেখি নাই একেবারে,
মায়েরে করেছে দীন হীনা।
ছিল যেই রাজরাণী, আজি সে যে ভিখারিণী
অভাগিনী বিষাদ-মলিনা॥
হায় হায় কি ভীষণ, মা'র বক্ষ বিদারণ,
ছিন্ন অঙ্গে লুটায় জননী।
সহেনা বিলম্ব আর, চল ভাই পুনর্ব্বার
ঘুচাইব এ দুঃখ এখনি॥
আমরা'ত সাত কোটি, যদি এক সাথে জুটি,
কিসে বা দুর্ব্বল, কিবা ভয়।
চল ভাই চল ভাই, আর ত সময় নাই,
ডাকে ঐ জননী সবায়॥
সব না এ অপমান, যায় যাবে যাক প্রাণ,
ঘুচাব ঘুচাব এই দুঃখ।
আবার মায়ের ঘরে, বসাইব কমলারে
উজ্জ্বল করিব মা'র মুখ॥

মহাত্মা রামমোহন রায় ও তাঁহার ধর্ম্ম।*

মানব জীবনের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে জননী জঠরে অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে আমরা কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম তাহা জানি না। জননীর জঠরে আমাদের সূত্রপাত কেবল এক শোণিত বিন্দুর ন্যায় একটী সামান্য কোষমাত্র। উহা ক্রমে বহুকোষে পরিণত হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয় সকল, শারীরিক যন্ত্র, তন্ত্র ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিকশিত হয় এবং যথাকালে আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করি। এখানে প্রথমে আমরা নিতান্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই বাস করি। পরে ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে এবং উহাদের সাহায্যে আমরা জগতের জ্ঞানলাভ করি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাবৃত্তি, ভাব প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির সীমা যে কোথায়, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। মানবমনে যে উচ্চ অসীম আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, তাহা আমরা সততই দেখিতেছি। আমরা আমাদের জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে কখনই সন্তুষ্ট নহি—যত পাই আরো তত চাই। এই যে অনন্ত পিপাসা, ইহা পৃথিবীর কয়েক বৎসর ব্যাপী জীবনে তৃপ্ত করা সম্ভব নহে। যিনি আমাদিগকে এই উচ্চ বাসনা সকল দিয়াছেন, তিনি কি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য আমাদিগকে সময় দিবেন না, তাঁহার ন্যায় ন্যায়বান করুণাময় পুরুষের পক্ষে ইহা কি সম্ভব? মানুষ যে এ জীবনেই কত উচ্চ ও মহৎ হইতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত যুগে যুগে এ পৃথিবীতে রাখিয়াছেন। সেই মহৎ আদর্শ সকলের দিকে তিনি আমাদিগকে সততই টানিতেছেন।

তিনি আমাদের শরীর, মন ও আত্মার রক্ষার্থে ও তাহার বিকাশের জন্য এ পৃথিবীকে ধনধান্য, জ্ঞান ও প্রেমপুণ্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সকল দানের মধ্যে এই মহাত্মাদিগের দান একটী বিশেষ দান। আজ এক শত চৌত্রিশ বৎসর অতীত হইল, এইরূপ এক মহাত্মাকে পরাধীন, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষে প্রদান করিয়াছিলেন। মহৎ লোকের মূল্য তাহাদের গুণানুসারে হইয়া থাকে। কেবল বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানে মহৎ হইলে হয় না; উহার সহিত যদি নীতি ও ধর্ম্ম না থাকে, উহার মূল্য অতি সামান্য। এমন কি এরূপ বুদ্ধি, মন্দ অভিপ্রায়ে নিয়োগ করিলে পরে তাহাতে জগতের ঘোর অনিষ্টপাত হয়। কিন্তু, কেবল মানসিক বলে মহৎ না হইয়া, উহার সহিত যদি চরিত্রবল সংযুক্ত হয় এবং তাহা জগতে উচ্চ অভিপ্রায়ে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। আলেকজাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ান বা ওয়েলিংটনের যে মহত্ব, তাহাতে শুভ অশুভ উভয়ই মিশ্রিত আছে। উহাদের কার্য্যের একদিকে যেমন গঠন

*মহাত্মা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সম্মিলন সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

প্রয়াসী, অপরদিকে তেমনি ধ্বংসকারী। অন্য এক শ্রেণীর মহৎ লোক আছেন, যাঁহাদের কার্য্য কেবল শুভ ও কল্যাণের নিমিত্তই আবিষ্কৃত। তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। এই শ্রেণীতে আমরা সক্রেটিস, প্লেটো, লুথার, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য এবং মহাত্মা রামমোহন রায়কে দেখিতে পাই। রামমোহন রায়ে অসাধারণ ধীশক্তি, সত্যানুরাগ, প্রেম, ভক্তি, ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি গুণাবলী একাধারে দেখিতে পাই। এই সকল সদ্‌গুণরাশীই জগতকে ক্রমশ উন্নতির পথে লইয়া যায়।

এইরূপ মহাত্মাদের জীবনে কয়েকটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, বিশ্বপ্রেম। তাঁহারা হৃদয়ে পৃথিবীর সকল লোক, সকল জীবজন্তুকে ধারণ করিয়া থাকেন, সকলের শুভ-কামনা ও মঙ্গলের জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাঁহাদের নিজেদের জন্য দুঃখ করিবার কিছু না থাকিলেও, পৃথিবীর দুঃখ, দারিদ্র্য, পাপ তাপের জন্য সর্ব্বদাই দুঃখিত। বুদ্ধদেব ত জগতের দুঃখ কষ্টের ভার লাঘব করিবার জন্যই সাধন করিয়াছিলেন। যিশুকে "Man of sorrows"—মূর্ত্তিমান দুঃখ বলিত। রামমোহন রায়ের প্রাণেও এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের আবাস ছিল। তিনি যে কেবল স্বদেশের দুঃখ কষ্ট, পাপ কুসংস্কার প্রভৃতির অন্ধকার দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সমগ্র পৃথিবীতে রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক উন্নতির বিষয়ে তাহার একান্ত সহানুভূতি ছিল।

কোন স্থানে ন্যায় ও সত্যের জয় হইয়াছে শুনিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিত। ১৮২১ খ্রীঃ স্পেন দেশে নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপনের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে, তিনি এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তজ্জন্য কলিকাতা টাউন হলে নিজ ব্যয়ে একটী প্রকাশ্য ভোজ (public dinner) দিয়াছিলেন। সেইরূপ পর্টুগাল দেশে ঐরূপ নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়াও তাহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছসিত হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে বিবাদের সংবাদ লইতেন। যাহাতে গ্রীকেরা তুরস্কবাসীগণের অধীনতা ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়, ইহা তিনি একান্ত হৃদয়ে কামনা করিতেন। নেপালবাসীরা স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ অকল্যাণ্ড নামক একজন ইংরাজের সহিত সে দিন তাহার সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল; তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, নেপালীদের দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে, সে দিন আর তাঁহার সহিত দেখা করিবার সাধ্য নাই। ১৮৩০ সালে ফরাসী বিপ্লবেও তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনীতির প্রতি তাহার দৃষ্টি অধিকতর আকৃষ্ট ছিল। এক সময়ে ইংলণ্ডের আইন অনুসারে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি পার্লেমেণ্ট সভার সভ্য হইতে অথবা গবর্ণমেন্টের অধীনে কোন কর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিতেন না। সেই সকল অন্যায় আইন রহিত হওয়ার জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। Repeal of Test and Corporation Act এ যখন উহারা স্বাধীনতা লাভ করিল ও ১৮৩০ সালে হুইগ্‌রা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি Reform

Bill পাস হওয়া সম্বন্ধে যে কেবল আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তজ্জন্ত অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সকল মহাজনদিগের জীবনে দেখা যায় যে ইঁহারা গতানুগতিকে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে নিজেরা একবার তলাইয়া দেখিবেন, সত্যের ভূমি কিছু পাওয়া যায় কিনা এবং জীবন মরণ পণ করিয়াও এই ব্রতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধি দ্রুমের তলে বসিলেন, আলোক না পাইলে উঠিবেন না। যীশু চল্লিশ দিবা রাত্রি অনাহারে অরণ্য মধ্যে পড়িয়া রহিলেন, সত্যের সাক্ষাৎ না হইলে উঠিবেন না। মহম্মদ হরা পর্ব্বতের গহ্বরে পড়িয়া চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, সত্যের আলোক না পাইলে প্রাণ রাখিব না। - এইরূপে তাহারা যে সত্য,যে আলোক পান তাহাতেই আজীবন চালিয়া দেন। বুদ্ধ যে নির্ব্বাণ মুক্তির মন্ত্র ধরিলেন, তাহা চিরজীবন তাঁহার জপমালা হইয়া রহিল। যীশু যে স্বর্গ রাজ্যের ভাব হৃদয়ে পাইলেন, তাহা আর তাহাকে ছাড়িল না। "এক ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই"—মহম্মদ শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহাই প্রচার করিয়াছিলেন।

মহাত্মা রামমোহন রায় চির-প্রচলিত মত ও ক্রিয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়া, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে,কুসংস্কার,দেশাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে. ১৬ বৎসর হইতে ৫৯ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান দেশ মধ্যে প্রচার ও ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। লোকে বলিতে পারে, রাম মোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগী ঋষিরা ভারতবর্ষে অনেক দিন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশে পরিপূর্ণ। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে নিরাকার পরমেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক উপাসনা প্রচার, তাঁহার বিশেষত্ব। তিনি বলিলেন "ব্রাহ্মণ কি চণ্ডাল, হিন্দু কি যবন, এস সকলে এক নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করি।" এই সার্ব্বভৌমিক উপাসনায় জনসমাজ প্রতিষ্ঠা জগতের পক্ষে, অন্ততঃ ভারতের পক্ষে, নূতন।

তৃতীয়তঃ, অপরিসীম সাহস। ইহা সকল মহাত্মাদের জীবনেই দেখা যায়। রাজার প্রসাদ বা ভ্রূকুটী, সকলই তাঁহারা তুচ্ছ করেন, কেননা তাঁহারা এ পৃথিবীর সুখ দুঃখের উপরে উঠিয়া থাকেন। পৃথিবীর অত্যাচারকেও ভয় করেন না, অবাধে জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। রামমোহন রায়ের অতুল সাহস ছিল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন ও নানা পণ্ডিতদের সহিত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষে তর্কবিতর্ক করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার অনেক শত্রু হইল। এমন কি, তাঁহার প্রাণবধের কল্পনাও হইয়াছিল। তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুরা রাত্রে গৃহের বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা শুনিতেন না। একদা কতকগুলি লোক তাহার গম্যপথের অদূরে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের অভিপ্রায়, তাঁহাকে আঘাত করে। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া নির্ভয়ে একাকী তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি চায়। তাহারা লজ্জিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিল।

চতুর্থতঃ, আশা। সকল মহাত্মারাই আশায় বলশালী ছিলেন। জগতের ধর্ম্মনিয়মের

প্রতি আশা, নিজদের প্রতি আশা ও মানবের প্রতি আশা। তাঁহারা সত্য ও সাধুভাব জয় অনিবার্য্য বলিয়া অনুভব করিতেন। মানব প্রকৃতি যে ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এইরূপ আশা ছিল বলিয়াই তাঁহারা এত নিষ্ঠার সহিত আজীবন কার্য্য করিতে পারিয়াছিলেন। এই আশার বলে বলীয়ান হইয়া, রামমোহন রায় ১৮৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় কলিকাতা আসিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।

পঞ্চমতঃ, ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর। তাঁহাদের নিজেদের প্রতি নির্ভর ছিল না, তাই মহাত্মারা এতদূর সাহসী হইতে পারিয়াছিলেন। সেই ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহাদের হৃদয় এত আশায় পূর্ণ ছিল। তাঁহারা দেখিতেন যে তাঁহাদের ক্ষুদ্র শক্তির পশ্চাতে ধর্ম্মের অদম্য ও অবিনশ্বর শক্তি রহিয়াছে।

ষষ্ঠতঃ, স্বার্থত্যাগ। যেখানে প্রেম, যেখানে বিশ্বপ্রেম, সেখানে স্বার্থ কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা আমরা জীবনের সকল বিভাগেই দেখিতে পাই। মহাত্মারা মানব জাতির কল্যাণের জন্য ধন, মান, রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, —জীবন দিতেও কখন কুণ্ঠিত হন নাই। রামমোহন রায় অর্থ ও সামর্থ সকলই দেশের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন; জীবনের শেষদশায় তাহার অর্থকষ্টও যথেষ্ট হইয়াছিল।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনের সহিত অন্যান্য মহাত্মাদের জীবনের কিছু বিশেষত্ব দেখা যায়। তিনি ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি জীবনের সকল বিভাগেই কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ পুরুষ অতি বিরল; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম মতের মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ দেখিতে পান নাই, প্রত্যুত, এ উভয়কেই মনুষ্যজীবনের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন। যে রাম মোহন রায় ভারতবর্ষে একেশ্বরবাদ, ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে অসাধারণ উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত ছিলেন, যিনি সুতীক্ষ্ণ তর্কশাস্ত্রে পৌত্তলিক, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদিগের বিচার-জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন, যিনি ভারতবাসিনী অনাথা বিধবাগণকে জ্বলন্ত চিতা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি অবলাকুলের মঙ্গলের জন্য বহুবিবাহ ও দায়াধিকারের অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার তেজস্বিনী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তিনিই আবার ভারতের অশেষ অনিষ্টের মূল জাতিভেদ প্রথার মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন, তিনিই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ ও সাধারণ হিতকর অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ভ্রাতৃগণের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

তিনি যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা তাহার কয়েকটী বিশেষত্ব আমরা এখানে সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

"প্রথমতঃ উদারতা। ব্রাহ্ম ধর্ম্মে কোন ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ, হিংসা বা ঘৃণার স্থান নাই। ব্রাহ্ম বিধাতার জীবন্ত বিধাতৃত্বে বিশ্বাস করেন; সকল ধর্ম্ম, সকল মহাজনের মধ্যে তাহার অভিব্যক্তি দেখেন, সেইজন্য তিনি উদার। শিশুর শরীর যেমন মাতৃজঠরে শোণিত বিন্দু হইতে ক্রমশ বিকাশিত হইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপে

বিকশিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহার বিকাশ এখন শেষ হয় নাই। ব্রাহ্ম অনুভব করেন, তিনি সেই বংশের সন্তান সমগ্র পৃথিবী যাঁহাদের বাসস্থান, ঈশ্বর যাঁহাদের পিতামাতা, সকল সাধু মহাজন যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জগৎ ও মানব-প্রকৃতি যাঁহাদের দুই প্রধান গ্রন্থ এবং স্বয়ং পরিত্রাতা ঈশ্বর যাঁহাদের শিক্ষক ও গুরু। সুতরাং ব্রাহ্ম উদার।"

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা।

"ঈশ্বরান্বেষণ, আত্মার উন্নতি সাধন ও মুক্তি লাভ বিষয়ে মানবাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীন। মুক্তি কেহ কাহাকেও দিতে পারে না, সকলকেই স্বাধীন ভাবে অন্বেষণ করিয়া লাভ করিতে হয়। পাপ হইতে পুরোহিত বা পোপ মুক্ত করিতে পারে না, দানে বা ধর্ম্মের বাহ্য ব্যাপারে কিছু হয় না ; পাপের যথার্থ প্রায়শ্চিত্ত—অনুতাপ ও ভবিষ্যতে তাহা হইতে বিরত হওয়া। মানব শিশু যেমন পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া পড়িয়া, হাঁটিতে শিখে সেইরূপ আমাদিগকে তত্ত্বচিন্তা, তত্ত্বানুসন্ধান, আত্মদর্শন, পাপ প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম, অনুতাপ অশ্রুপাত প্রভৃতির দ্বার দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

"ধর্ম্ম জীবনের প্রাণ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন তত্ত্বান্বেষণ। প্রকৃত স্বাধীনতার মূল মন্ত্র এই —ঈশ্বর প্রত্যেককে মূলধন স্বরূপ দেহ মনের যে কিছু শক্তি সামর্থ দিয়াছেন, সে তাহার নিজ জীবনের মহত্ত্ব সাধনের জন্য নিয়োগ করিবে। সত্যে ও ঈশ্বরে বিমল প্রীতি না জন্মিলে মানুস যথার্থ স্বাধীন হইতে পারে না ; সে আসক্তি ও ভীতির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেনা, সে বন্ধন দশাতেই থাকে ; সে বাহিরে দেখিতে স্বাধীন হইলেও, পরাধীন।

"তৃতীয়তঃ, আধ্যাত্মিকতা। প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়াছেন—উপাস্য দেবতার সন্তোষার্থে কিছু দিতে হইবে ; ব্রহ্মধর্ম্ম ও বলিতেছে, ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে কিছু হইতে হইবে। প্রাচীন ধর্ম্মসাধন প্রণালীতে দেখা যায়, তুমি যাহাই হও, যেরূপ হও, যদি কিছু দিতে পার, নৈবেদ্য বা বলি বা দেব দ্বিজে দান প্রভৃতি, তবেই দেবতা প্রসন্ন ; সব পাপ ক্ষয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলে তুমি কিছু দিতে পার আর নাই পার, তোমার চরিত্রকে ঈশ্বরারাধনার, উপাসনার উপযোগী করিতে হইবে। তিনি সত্য স্বরূপ, ন্যায়স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ ও পবিত্র স্বরূপ; তাঁহার আরাধনার উপযুক্ত হইবার জন্য তোমাকে সত্য, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতাতে উন্নত হইতে হইবে। অর্থাৎ, জ্ঞানকে মার্জ্জিত করিতে হইবে, বিবেককে উজ্জ্বল করিতে হইবে, এবং পবিত্রতাকে দৃঢ় করিতে হইবে। আরাধনাকে কোন বিশেষ মুহূর্ত্তের বা বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা মনে না করিয়া সমগ্র জীবন আরাধনা করিতে হইবে।"

"চতুর্থতঃ, সাম্য। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন যে জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানবাত্মার পরমেশ্বরকে জানিবার পক্ষে ও তাঁহাকে প্রীতি করিবার পক্ষে সমান অধিকার। ইহা এ দেশের পক্ষে নূতন। যে দেশের প্রচলিত উপদেশ, ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ হইতে, শূদ্র পদ হইতে উৎপন্ন—ধর্ম্ম যাজনে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে শূদ্রের অধিকার নাই—সে দেশে এই মহাসত্য সামাজিক জীবনে এক নূতন আদর্শকে উপস্থিত করিতেছে।"

পূর্ব্বোক্ত আদর্শের বিষয় চিন্তা করিলে সমাজ ও পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা অনুভব করা যায়। উহার মধ্যে সাম্য, সুনীতি,

জ্ঞানালোচনা, ন্যায়পরতা, প্রীতি, পবিত্রতা, চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা এবং উদারতার স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত। এই সুন্দর ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যেন আমাদের জীবনে ও পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।”

উপসংহারে আমরা এখানে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে উক্তির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

“তাঁর শরীরের বল, মনের বীর্য্য, হৃদয়ের ভাব সকলই অনুরূপ। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য এখানে উদিত হন। তিনি জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একাকী অসংখ্য প্রকার পৌত্তলিকতার সহিত নিরন্তর যুদ্ধ করিলেন এবং সকলকে পরাভূত করিয়া অবশেষে গঙ্গার স্রোতের উপর এই সমাজ-রূপ জয়-স্তম্ভ নিখাত করিলেন। তিনি যে সময় উৎ-পন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়কার ভীষণ সামা-জিক ভাব ও অবস্থা মনে হইলে হৃদ্‌কম্প হয়। তখন অন্ধকারের কাল, দ্বিপ্রহরা রজনীর কাল, এখন আমরা সে সময়ের ভাব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না, যে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের নামে সকলেই খড়্গ-হস্ত হইত। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্য ভূমি ছিল। ভ্রষ্টাচারের পিশাচ সকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শত সহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠার হস্তে সেই ঘোর অবিদ্যা-রণ্য সমভূমি করিয়া দেশোদ্ধারে প্রবৃত্ত হই-লেন এবং অবশেষে তাহাতে ব্রহ্মসমাজ রূপ বীজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সংসারের মধ্যে আনয়ন করিলেন। তঁহারই প্রখর জ্ঞানশাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্ন ভিন্ন হইল। তাঁহারই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবৃষ্ট হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার কত যত্ন করিতে হই-য়াছিল; তাঁহার ধন গেল, সমুদয় বিষয় গেল; তখন তাহার মনে এই আনন্দ ছিল যে ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহার আশা সফল করিবে। তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা কর্ষণ করিয়া উহাকে উর্ব্বরা করিব। যে মহাত্মা আপনার হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রথম পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, আমরা যেন তাঁহার দৃষ্টা-ন্তের অনুকরণ করি। যখন তিনি কলিকাতা নগরে আসিলেন, তখন লোকে তাঁহাকে ধর্ম্ম চ্যুত, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট, নরকে পতিত বলিয়া তিরস্কার করিত। কিন্তু ক্রমে সে সময়কার কলি-কাতার ক্ষমতাপন্ন অনেক বড় মানুষ তাঁহার সহচর হইলেন। ধর্ম্ম সভা তাঁহার বিপক্ষদল, সতী দগ্ধ করিবার দল, তাঁহাদের আধিপত্য অত্যন্ত অধিক। তাহারা ব্রাহ্ম সমাজকে জ্বালাইয়া দিবেন বলিতেন, কেহ বলিতেন রামমোহন রায়কে মারিয়া ফেলিবেন, কিন্তু তিনি গম্ভীরভাবে সমাজে আসিয়া উপাসনা করিয়া যাইতেন, কোন সহযোগী সঙ্গে থাকুক আর না থাকুক। তিনি মাণিকতলা হইতে পদব্রজে সমাজে আসিতেন। এই একটী তাঁহার অতীব শ্রদ্ধার ভাব ছিল।”

শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার মৃত্যুতে লিখিয়াছিলেন—“তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিল ভূমি পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল। তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূলপক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত হইতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি যার

বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে ও জয়সাধন করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার উদ্দেশ্যে আততায়ী-স্বরূপে বলদুর্ম্মদ বীরপুরুষের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছ এবং বিচারযুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্‌রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা, জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়, তুমি একটী সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। যাহারা আবহমানকাল হিন্দুজাতীর মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছ অতএব তুমি রাজার রাজা।"

আমাদের তাঁহার সেই মৃত্যু দিনের শৌচ অদ্যাপিও চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নহেন। তিনি ভূলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথায় চিরাবলম্বিত চিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কতবার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ উদ্দীপন ও কত শুভ সংকল্প সংসাধন করিয়া আসিয়াছে। অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। জীবিত কালের সদভিপ্রায় বলে ও নিজচরিত্রের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার সাধন ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

প্রেমবিদ্ধা।

(১)

আশ্বিন মাসের ভোরের বেলায়—
বাগান তখন ফুল্-পরা,
সতেজ শ্যামল তরুর তলায়,
গঙ্গা ছিল কূল্-ভরা,—
দাঁড়িয়ে তুমি (আত্মমগ্ন)
শিউলি গন্ধি বাতাসে,
খুঁজ্‌তেছিলে নিশার স্বপ্ন,
আশায় এবং হতাশে,
ক্ষণেক পরে উঠ্‌লে কেঁপে—
উঠলে কেঁপে সহসা,—
তরঙ্গেতে অঙ্গ ছেপে,
গঙ্গা যেমন বিবশা।

(২)

ডাক্‌ল পাখী মিঠে গলায়,
তুমি কাণে ভুল্লেনা ;
নাচ্‌ল ছায়া গাছের তলায়,
তুমি তাতে ভুল্লেনা,
পাতার গায়ে বাতাস বেজে,
উঠ্‌ল ঘন স্বনে গো,
তোমার পানে (ফুলে সেজে)
চাইল তরু বনে গো।
তুমি ছিলে বন্যা-জলে,
কূলে কূলে ফুলিয়া,—
গঙ্গা সম গেলে চলে,
তরঙ্গেতে দুলিয়া।

(৩)

তাহার পরে সূর্য্যকরে,
ঝলকিল ধরণী,
শাদা মেঘের মতন বেগে,
গঙ্গাবক্ষে তরণী.

চন্দ্র ছুটে, উঠ্‌ল ফুটে,
চূর্ণ ঢেউএর বুদ্‌বুদে,
তারার কণা, হীরার দানা,
গাঁথা সোণার বিদ্যুতে।
প্রেমের বানে, সুখের টানে,
তুমিও গেলে অন্বিত,
প্রীতির ধারার মাঝে ধরা
কবি প্রতিবিম্বিত।

(৪)

নিরবধি গঙ্গানদীর
মতন্ যদি বহিতে,
ভোরের পাখী, কুসু-কথায
নিত্য যদি কহিতে,
সিন্ধু পানে স্রোতের টানে,
চলে যেতে ছুটিয়া,
হীরাগাঁথা ঢেউএর মাথায়
উঠ্‌ত আলো ফুটিয়া।

*　　*　　*　　*

ক্ষীণ ধারায বালির কারায,
গড়িয়ে অতি মন্থরে,
তিলে তিলে শুকিয়ে গেলে
শুষ্ক মরুপ্রান্তরে।

(৫)

আজো ভোরের বাগান ভরে,
ফোটে ফুলের কলিতো,
শিশিরসিক্ত বায়ু নিত্য,
ফুলের গন্ধে দলিত,
গাছের তলায় ছায়া খেলায়,
স্বপ্নে রচি জড়িমা,
গঙ্গাজলে উছ্‌লে চলে
কিরণমাখা গরিমা।
তোমার ব্যথা তোমার কথা
নেইক কারো স্মরণে।
মাটির পৃথিবীর দৃঢ় ভিত্তি,
মানুষ মরে মরণে।

২

মাটির ভাণ্ড তাপে গড়া　সুখের বাঁধন্ পাপের ছড়া;
নির্ম্মম এ বিধি অতি অলংঘ্য।
প্রাণটা যাহার বিশ্ব-জোড়া, তারি বেশি কপাল পোড়া;
প্রীতির সুধার ধাবে ঝরে কলঙ্ক।
ও গো সতি, ব্যথিত প্রাণে　থাক্‌তে চেযে অতীত পানে,
মুখ্‌খানি লুকিয়ে ঘরের কোণে গো,
পায়ে ঠেলে তোমায় লোকে　দেখ্‌ত চেযে ঘৃণার চোখে,
মোদের চেয়ে বাঘ্ ভালুকো　বনে গো
মনে হয় যে ভাল বন্ধঃ।　ধিক্ মানুষের পুণ্য ধরম্!
পর্‌কে দলে চরণ্ তলে, সাধুতা?
যত ভণ্ড যত চোর,　গলায় তাদের তত জোর,
নীরব সাধুর মাথায় তাদের পাদুকা।

৩

এড়িয়ে ভবের দুঃখ নানা,　ছড়িযে তোমার প্রেমের ডানা
উড়ে গেছে পতিপ্রাণা, কোথা সে?
গঙ্গাতীরে ভোরের বেলায　শিউলি গন্ধে ছায়ায তলায়
খুঁজেছিলে যারে আশায হতাশে,
আজ্‌কে আবার শরৎকালে,　পাখায ২ তালে তালে,
তারি সাথে যাচ্চ উড়ে সুদূরে?
ভবের জ্বালা ফেলে পিছে,　জন্ম মৃত্যু রেখে নীচে,
পেযেছ কি প্রেম পুণ্য শুধুরে?

৪

(তুমি) চলে গেছ বোন্　নাজানি সে কোন্　রাজ্যে।
ফেলে গেছ হায়　শিশু অসহায়　আজ্‌যে।
(তুমি) ভুলেছ কি তার　ক্ষীণ করুণার　ক্রন্দন?
ছোট বক্ষের　মৃদু দুঃখের　স্পন্দন?
(তুমি) ভুলেছ ব্যাধের　শুষ্ক আঘাতের　স্মৃতি কি?
পেয়েছ তোমার　চির সাধনার　প্রীতি কি?
(তুমি) চলে গেছ বোন্　বহিযে জীবন-　বাহিনী,
ফেলে গেছ দেব　দীর্ণ প্রাণের　কাহিনী।

৫

তোমার দুঃখ ফুরিয়ে গেছে
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে।
এখন্ তোমার ব্যথায়, দুখের　ত্যক্ত অশ্রু, রক্ত বুকের
পাষাণ থেকে মুছে চেঁচে
রাখ্‌ছি আমি কুড়িয়ে।

কুড়িয়ে ইতিহাসের খাতা,　জুড়ে নিয়ে ছেঁড়া পাতা,
শোক-বিদ্ধ অনুরাগে
গড়্‌ছি প্রাচীন যাতনা।

মুছে গেছে অনেক লেখা, লুপ্ত দুঃখের শীর্ণ রেখা
ফুটিয়ে নিয়ে কালো দাগে
কচ্চি নানা ভাবনা।
দেখ্‌চি চেয়ে ফিরে ফিরে কঠোর সমাজ শিলার শিরে,
প্রীতির স্মৃতি-ধ্বজা যথায়
রেখে গেছ উড়িয়ে।

অশ্রু গড়ায় আমার চোখে, ঘৃণার হাসি হাসে লোকে,
তোমার আজ্‌কে চিন্তা কি তায়?
ভাবনা গেছ পুড়িয়ে।
দুঃখ তোমার ফুরিয়ে গেছ
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নমঃশূদ্র।*

বিংশ শতাব্দীর নূতন আলোক সমগ্র দেশ মধ্যে একটী জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে, নিদ্রিত জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই চারিদিকে একটা উত্থানের শব্দ, একটা হুটোহুটি, ছুটাছুটি দেখা যাইতেছে। উচ্চ শ্রেণীর জাতি সকল উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যাহারা নিম্নে নিরাপত্তিতে অবস্থিতি করিত, তাহারাও উঠিতে চাহিতেছে। এটা কোন ভয়ের লক্ষণ নহে, এটা নব জীবনের লক্ষণ, সুতরাং চিন্তাশীল বুদ্ধিমান সমাজ-নেতৃগণের ইহাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। যাহারা মনে করেন, থামাইয়া রাখিবেন, তাহাদের ভুল। যখন ভূকম্পনে গিরি বিদীর্ণ হইয়া উঠে, কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে। ঐরাবত জাহ্নবী স্রোত রোধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু জাহ্নবীর প্রবল স্রোতে তাহার প্রকাণ্ড দেহ ভাসিয়া গেল। আবার ইহাদের কেবল যে বাধা দেওয়া আবশ্যক নহে, তাহাও নহে, ইহাদের উৎসাহ দেওয়ার দরকার, কারণ সমাজ-দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ও বলই সমাজের সবলতার লক্ষণ। অতএব উচ্চ জাতিদিগেরও কর্ত্তব্য, ইহাদের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষায় সাহায্য করা। এজন্য এই নমঃশূদ্র জাতির নব-উত্থানের দিনে সর্ব্বাগ্রে সেই সর্ব্বশক্তিমান বিশ্ববিধাতার শান্তিময় অভয় চরণে প্রার্থনা করি, তৎপরে দেশের ধনী, মানী, পণ্ডিত, উচ্চবংশীয় মহাত্মাগণের সহানুভূতি ও সাহায্য যাচ্ঞা করি। তাঁহারা সমগ্র হিন্দ্‌ জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র ভারতীয় জাতির কল্যাণের জন্য, ভারত-মাতার সকল সন্তানকে উন্নত পদবী প্রদান করিতে সাহায্য করুন। নতুবা তাঁহাদের ও সমগ্র দেশের কল্যাণ সাধন সুদূর-পরাহত।

ভাই নমঃশূদ্র, তোমাদের উত্থানের জন্য আমাদের প্রধান পরামর্শ এই—"ইংরাজীতে, একটী কথা আছে, আপনাদিগকে সাহায্য কর, ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করিবেন।" যে কৃষক আপন জমি চাষ করিয়া রাখে, ও চারিদিকে আলি বান্ধিয়া রাখে, স্বর্গ হইতে আগত বারিধারা তাহার জমিকেই বপন করিবার শক্তি প্রদান করে। যে কৃষক তাহা করে না, স্বর্গের বৃষ্টি তাহার কোন কাজেই আসে না। তাই বলি, তোমরা আত্মোন্নতির চেষ্টা কর, দেখিবে, সকল অবস্থা তোমাদের অনুকূল হইবে। তোমরা নিজেরা শিক্ষিত হইতে আরম্ভ কর। আমাদের কলম-পেশা ভদ্রলোকের বিকৃত শিক্ষা প্রণালী দেখিয়া তোমরা কিছুও মনে করিও না, শিক্ষা কেবল কেরাণীগিরির জন্য বা রাজসেবার জন্য। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, শারীরিক ও

* নমঃশূদ্র-সভায় পঠিত।

মানসিক বিকাশ ও প্রকৃত ফল, দেশের কৃষি, বাণিজ্য, নাবিক-বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, বৈজ্ঞানিক উপকরণ-সংগ্রহ, দেহ-রক্ষা, সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি, ধর্ম্ম কর্ম্মের বৃদ্ধি। এই শিক্ষাই আমাদের দেশে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনিবে। যেদিন দেখিব, একজন কৃষক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজের জমিতে নূতন ফসল দ্বারা অন্যের দশ গুণ লাভ করিতেছে সেদিন বলিব, সে শিক্ষিত কৃষক। যেদিন দেখিব, একজন নাবিক নৌকায় একটি নূতন কল যোজন করিয়া ষ্টিমারের ন্যায় দ্রুত বেগে নৌকা চালাইতেছে, সেদিন বুঝিব,সে শিক্ষিত নাবিক। যেদিন দেখিব, একজন হিমালয়ের কালস্তর দেখিয়া তাহার নিম্ন খনন করিয়া নূতন ধাতু উঠাইয়া আনিলেন, সেদিন বুঝিলাম,তিনি খনিজ পণ্ডিত। উদাহরণ বাড়াইতে চাই না। শিক্ষার এমনি শক্তি, যে সমাজের যে যেখানে থাকে, সেই স্থানে সে যেন একটী স্তম্ভ রূপ সমাজ দেহকে ধারণ করে।

উন্নতির ইতিহাসের প্রধান কথা, প্রথমে তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের অনুসন্ধান কর, বাকী সব তোমরা প্রাপ্ত হইবে। প্রথমে তোমরা ধার্ম্মিক হও। আমরা আর্য্যজাতি—আমরা হিন্দু নাম গ্রহণ করিয়াছি, তদপেক্ষাও আর্য্য নাম উন্নত—এই জাতির মধ্যে শনক সনন্দ সনাতন, ধ্রুব প্রহ্লাদ শুক, নারদ বৈশম্পায়ন জনক, ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস, কত নাম করিব, কত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বেদ উপনিষৎ বেদান্ত, পুরাণ ভাগবৎ গীতা প্রভৃতি কত মহান্ শাস্ত্র আবির্ভূত হইয়াছিল! কোথায় লাগে ইঁহাদের কাছে বাইবেল। এ সকল পড়িলে বাইবেল পড়িতেই ইচ্ছা হয় না, বাইবেলকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াই বোধ হয় না। সুতরাং ভ্রাতৃগণ, এই পবিত্র গৌরব ভুলিওনা যে, আমরা আর্য্যবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্ম বিষয়ে নানা মত, নানারূপ সম্প্রদায়। এই জন্য আমাদের আর্য্যজাতি আবার নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সহানুভূতি হারাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাত্মা চৈতন্য দেব সকলের মিলন-ভূমি করিয়াছেন—হরিনামে। এই হরি বেদ বেদান্তের ব্রহ্ম, পৌরাণিকের বিষ্ণু ও তান্ত্রিকের শিবশক্তি। এই হরি মুসলমানের আল্লা ও খ্রীষ্টানের God—এই হরি সকল নরনারীর আশ্রয়-দাতা, মুক্তি-দাতা ও ত্রাণ-কর্ত্তা। ভাই, তোমরা সকলে এই হরি-নামে প্রণাম কর, শ্রীহরির শ্রীচরণে জীব-নোৎসর্গ কর। এই হরি-সঙ্কীর্ত্তনে উচ্চ জাতি নিম্ন জাতি সকলে একত্র হইবে। এই হরিনামে প্রজা, রাজা, দুঃখী, ধনী সকলে একত্র হইবে। তাই, এস ভাই সকল, আমরা সেই পরম শরণ পরমাত্মন হরিচরণে শরণাপন্ন হই। তাঁহার সাধন ভজনের প্রধান অঙ্গ, চরিত্র গঠন। চরিত্র বিনা কেহই মহত্ব লাভ করিতে পারে না। বাই-বেলের ন্যূনতা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু যদি একটী কথা না বলি, তবে সেই পাশ্চাত্য মনীষীগণের প্রতি অবিচার করা হইবে। বাইবেলে এক স্থানে সকল সুনীতির উপদেশ আছে। সে সকল তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিবে ও তদনুসারে কার্য্য করিবে।

১। নরহত্যা করিও না।
২। চুরী করিও না।
৩। ব্যভিচার করিও না।
৪ মিথ্যাকথা বলিও না।
৫। যাহা নিজে ভালবাস না, অন্যের প্রতি তাহা করিও না।
৬। এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হরি বল, ব্রহ্ম বল, একই তিনি।

৭। সকল নরনারীকে ভালবাসিবে ও সমান বলিয়া মনে করিবে।

এই সকল সত্য জীবনে সর্ব্বদা অঙ্কিত রাখিতে হইবে। এবং যেন কোনক্রমে পাপ পঙ্কে লিপ্ত না হইতে হয়, এইরূপ করিবে। জগতে যে জাতি চরিত্রবান, যে জাতি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, পরোপকারী, পবিত্র-হৃদয়, তাহারাই জগতে অভ্যুন্নতি লাভ করে। তুলসীদাস বলিয়াছেন।

"সার কহ পরোপকার পরনারী নৈরাশ,
এমাম হরি নাহি মিলে তো জামিন
তুলসীদাস।"

এতএব ভ্রাতৃগণ, তোমরা এমন ভাবে ধর্ম্মপথে থাকিয়া জীবন যাপন করিবে যে, করুণানিধান ভগবান তোমাদের সপক্ষ হইবেন। তিনি যাহাদের সহায়, জগতে কেহ তাহাদের বিনাশ করিতে পারে না। তিনি ধার্ম্মিকের সহায়, যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়। তোমরা যদি এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে চাও, ধর্ম্ম পথ আশ্রয় কর।

৩। সাম্প্রদায়িক উন্নতি। হিন্দু জাতির ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক কলহ চিরদিন নানাবিধ মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। এমন কি, আমার মনে হয় যে ২২ কোটী হিন্দু জগতে যে এত হীনভাবে দিন যাপন করিতেছে, এই ভেদনীতিই তাহার ফল। যে ইংলণ্ড আমাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেছে, তাহার লোক সংখ্যা আর দুইটী দ্বীপ ধরিয়াও ৪ কোটী মাত্র, যে জাপান আজি জগতের সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার লোক সংখ্যাও ৪ কোটী মাত্র। আর আমরা ২২ কোটী হিন্দু ও ৮ কোটী মুসলমান, জগতে ধূলিকণার ন্যায় নগণ্য সমুদ্রতীরস্থ বালুকা-কণার ন্যায় কেবল পদতলে অবস্থান জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এই ভেদনীতি বাস্তবিকই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা কি দেখিতে পাই? যদি একজন মুসলমানকে একজন কোন কথা বলে, তবে সমুদয় মুসলমান জাতি তাহার সপক্ষ দাঁড়াইবে। যদি একজন সাহেবকে কোন কথা বলি, সমস্ত সাহেব একত্র হইয়া প্রতিবাদ করিবে, আর যদি কোন হতভাগ্য হিন্দুকে কোন লোক পদাঘাত করে, অন্য হিন্দু তজ্জন্য নাকে কাটি দিয়াও হাঁচিবে না। কেননা, আমরা পরস্পরকে পরস্পর ঈর্ষা কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি? এ অভাব দূর না হইলে এ জাতির কখনও উন্নতি হইবে না। আজি নমঃশূদ্র জাতি এই ভেদনীতির প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান, সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আজি সমদর্শীতার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। হিন্দু জাতি সমদর্শীতা শিক্ষা করে নাই, তাই আজি ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। নমঃশূদ্র জাতির কতকগুলি অভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, উচ্চ জাতির নিকট তাহারা এই সকল দূরীকরণের জন্য প্রার্থনা করিতেছে।

১। অস্পৃশ্যতা। কেবল নমঃশূদ্র জাতি নহে, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও হিন্দু জাতির আর আর সম্প্রদায়ও এই আপত্তি করিয়া থাকে। বিড়াল কুকুর গৃহে গেলে গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট হয় না। অথচ নমঃশূদ্র জাতি ঘরে গেলে নষ্ট হইবে। এরূপ বিদ্বেষ বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। কিন্তু সমাজ এতদিন ইহা চল রাখিয়াছেন, এবং নমঃশূদ্র জাতি ইহা নীরবে সহ্য করিয়াছে। ব্রাহ্মণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া বাড়ীতে আসিলেও নমঃশূদ্রের সাধ্য নাই যে, এক গ্লাস

জল দিয়া সাহায্য করে, অন্যান্য উচ্চ বর্ণের পক্ষেও সেই কথা। কেন এরূপ হইল? হইতে পারে, কোন অতীত সময়ে এই জাতি আর্য্য জাতির নিকট কোন অপরাধ করিয়াছিল, সেইজন্য, ইহারা এই হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কত শতাব্দী গত হইয়াছে, আজিও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? কোন বৈদ্যুতিক কি কোন চৌম্বক আকর্ষণের কারণে যে কিছু হইতে পারে, আমি সে কথা বিশ্বাস করি না। নমঃশূদ্র জাতির এক গ্লাস জল পান করিলে যে আমার দেহে কোন অপবিত্রতা আসিবে, একথাও আমি মনে করি না। কিন্তু এইসামাজিক হীনাবস্থা কে দূর করিবে? কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভাই নমঃশূদ্র,তোমরা খ্রীষ্টান হও, তাহা হইলে এ ভেদ-নীতি থাকিবে না, কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল, কেননা যাহারা নমঃশূদ্রের জল পান করে না, তাহারা খ্রীষ্টানের জলও পান করে না, বরং নমঃশূদ্রকে দেবালয়ে অন্দর মহলে যাইতে দেয়, খ্রীষ্টানদের তাহাও দেয় না। মুসলমানের কথাও সেই রূপ। খ্রীষ্টান, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুর বিদ্বেষ আরও অধিক, সুতরাং ইহাতে তাহাদের উন্নতি হইবে না। তবে তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিবে? বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার মনে হয় যে, তাহারা যদি স্মৃতি শাস্ত্রের ব্যবস্থা-প্রদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট আপনাদের হীনাবস্থা দূর করিবার জন্য আবেদন করিতে পারে, সমাজে তাহাদের স্থান কোথায় এবং কি কার্য্য করিলে উন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থার প্রার্থনা করিয়া নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর, কাশী প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজে আবেদন করে, এবং প্রয়োজনমত কিছু অর্থ প্রদান করে, তবে যাহাতে উচ্চ বর্ণের সহিত মিশিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া সম্ভব। তাই আমি নমঃশূদ্র জাতিকে অনুরোধ করি,সময় বিলম্ব না করিয়া তাহারা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে আপনাদের আবেদন প্রেরণ করুন। আমার বিশ্বাস, একবার ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিলে এ কার্য্যে কাহারও আপত্তি হইবে না। এ সময়ে সাম্যের বায়ু চারিদিকে বহিতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এই জাতীয় বৈষম্য ও বর্ণ-ভেদের দূষণীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এক বার মাত্র পাতি বাহির করিতে পারিলেই, বোধ হয়, এ বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

২। যে কারণ উপরে উল্লেখ করিলাম, উক্ত কারণেই উচ্চ জাতীয় হিন্দুগণ তোমাদের সহিত একাসনে বসিতে চায় না। এই বৈষম্য দূর করিতে হইলে প্রথমে তোমরা উন্নত শিক্ষা লাভ কর। আজি যদি তোমরা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কি ডাক্তার-সাহেব, কি জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিতে পার, তোমরা সমাজে বসিলে অন্য লোকে গৌরব বোধ করিবে। তোমরা সম্প্রদায় গঠন করিয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, সকলে তোমাদের সহিত একাসনে বসিয়া কীর্ত্তন ও হরিনাম করিবে—এ বিষয়ে কোন আপত্তি হইবে না। তোমরা হরিনাম করিয়া মহোৎসব দেও, অনেক জাতি তোমাদের সহিত আহার করিবে। তোমরা সচ্চরিত্র ও হরি-ভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে আহ্বান কর। তাহারা তোমাদের সমকক্ষ মনে করিয়া তোমাদের সহিত আহারাদি করিবেন। শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ন হইয়া,শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা গ্রহণ করিয়া,এই সকল জাতির সহিত মিলিত

হও। আভ্যন্তরীন সারবত্তা থাকিলে কাহার সাধ্য তুচ্ছ করে?

আর একটী কথা বলি। তোমরা যদি উচ্চ হইতে চাও, উচ্চ জাতির সহিত বিরোধ করিও না। বিরোধ করিয়া অধিকার প্রাপ্ত হইবার আশা সুদূরপরাহত। একদিকে জেদ হইলে অন্য দিকেও জেদ হয়। সুতরাং উচ্চ জাতির কার্য্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিতে চেষ্টা না করিয়া বৈধ উপায়ে কার্য্য করিতে আরম্ভ কর। কার্য্য বন্ধ করিলে উচ্চ জাতিদের ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যাহারা কর্ম্ম বন্ধ করিবে, তাহাদের কি প্রকারে চলিবে? তাহারা কি হঠাৎ কোন স্থান হইতে জমীদারী পাইবে, না একদিনে তাহারা বড় উকীল কি মোক্তার হইবে? না, বরং তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চুরি ডাকাতি, এই সকল পাপ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পাপই বিনাশের মূল, পাপ অবনতির কারণ। পাপে মৃত্যু,একথা তোমরা শুনিয়াছ, অতএব কদাচ কুকার্য্যে রত হইও না। যাহারা চরিত্র সৎ রাখিয়া সৎ কার্য্য করে, তাহারই সম্ভ্রান্ত; আর চরিত্র দূষিত করিয়া যে কার্য্য সম্পাদিত হয়,তাহাই অসম্মানের কার্য্য। তোমরা বোধ হয় গল্প শুনিয়াছ যে, এক সাধুর নিকট হইতে এক ব্রাহ্মণ একটী চস্‌মা পাইয়াছিল, তাহা চক্ষে দিয়া রাজসভায় গিয়া সভাস্থ সকলকেই পশু পক্ষীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইল। রাজাকে বানর বলিয়া প্রতীয়মান হইল, কিন্তু একজন মুচি জুতা সেলাই করিতেছিল, তাহাকেই প্রকৃত মনুষ্যরূপে দেখিতে পাইল। যে সাধু হয়, পুণ্যবান হয়, সে যেখানে থাকে, যে ব্যবসায় করে, তাহাতেই তাহার সম্ভ্রম হয়। অতএব পুণ্য পথে থাকিয়া, তোমরা সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা কর; অবশ্যই উন্নতি হইবে। আমি শুনিয়াছি যে, অনেক নমঃশূদ্র প্রকৃত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্য করিয়া আপনাকে পাপ পথে ও নরকে নিমজ্জিত করিতেছে, ও লোকের অনেক অনিষ্ট সাধন করিতেছে। একথা প্রকৃত কিনা, সাধারণে বলিতে পারেন। যদি এরূপ হয়, লজ্জার কথা। আমি ভরসা করি, সমবেত নমঃশূদ্রমণ্ডলী এই সকল লোককে শাসনে রাখিবেন। পাপ, আত্ম বিনাশের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যাহারা এ পন্থা অবলম্বন করে, তাহারা অচিরে ইহার কুফল ভোগ করিবেই করিবে। সরল সত্য পথে থাকিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করা গীতার ধর্ম্ম। ইংরাজীতেও কথিত আছে,যে আপন কার্য্যে তৎপর সে রাজার নিকট আসন পাইবে। যিনি যে ব্যবসা করেন, সেই ব্যবসায় সাধু ভাবে সম্পাদন করিলে নিশ্চয়ই সুখী হইবেন। অতএব আমার এই অনুরোধ, সমগ্র নমঃশূদ্রমণ্ডলী একত্রিত হইয়া আপনাদিগকে কর্ত্তব্য-কর্ম্মপরায়ণ কর। দেও এবং লও, এই জগতের মূল মন্ত্র। কার্য্য দেও পয়সা লও,এবং পয়সা দেও কার্য্য লও, জগৎ এই আদান প্রদান নিয়মে গঠিত। ইহাতে কাহারও মানাপমান নাই।

আমার বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-সম্বলিত আর্য্যজাতি একটী প্রকাণ্ড দেহধারী মহান্ দেবতা। কেহ তাহার হস্ত, কেহ তাহার মস্তক, কেহ তাহার পদ ও কেহ তাহার উদর। প্রত্যেকের সম্মিলিত উদ্যম ও কার্য্যই এই মহান সমাজের জীবনী শক্তি। যখন সমাজে ক্ষত্রিয় শক্তি প্রবল ছিল, কোন বিদেশীয় জাতির শক্তি ছিল না যে, এই

আর্য্যভূমিকে অপদস্থ করে। আজি ভেদ নীতি বলে, পরস্পর পরস্পরে বিবাদ করিয়া সমগ্র আর্য্যজাতি নির্ব্বীর্য্য হইয়াছেন। এক্ষণে যে প্রকাণ্ড দেহধারী মহান্ দেবতার কথা বলিলাম, তাহা দ্বিমুখ সাপে পরিণত হইয়াছেন, মস্তক চলিতে চাহিলে লেজ চলিতে চায় না। কাজেই মন্থর গতিতে শত্রু আসিয়া তাহাদের মস্তক পীড়ন করে। তাহার তেজ, বীর্য্য, প্রভাব, সকল ভেদনীতি বশে ও আত্ম কলহে অন্তর্হিত হইয়া যায়। নতুবা মুষ্টিমেয় পরধর্ম্মাবলম্বীগণ কি আমাদের দেবতার ও আমাদের সতীর অপমান করিতে সাহসী হয়? আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখুন। ইউরোপে যে সমস্ত বীর জাতির ইতিহাস আমরা পাঠ করি, তাহা মুষ্টিমেয়। কেহ অর্দ্ধ কোটী, কেহ এক কোটী, বড় বেশী হইলে ২।৪ কোটী। আর আমরা ৩০ কোটী লোক কি এক মোহ নিদ্রায় মুগ্ধ হইয়া অনন্ত আলস্যে আমাদের জীবন কাটাইয়া দিতেছি! লোকে শুনিলে হাসিয়া অজ্ঞান হয় মনে করে, ইহারা মেষ জাতি। এমন এক সময় ছিল, যখন এই আর্য্যজাতি আন্দোলন করিয়া তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতারে বৌদ্ধপতাকা উড্ডীন করিয়াছিল। তখন তাহারা যেত লাক ছিল, আজি তাহার ৩ গুণ লোক হইয়াছে। অথচ আমরা দীনহীন ও পরপদ লেহনকারী হইয়া জগতে মানবজাতির কলঙ্করূপে পরিণত হইয়াছি। যাঁহারা ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, যাঁহারা ভূগোলের বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা মনুষ্যত্বহীন এক পঞ্চমাংশ ভারতীয় জাতির এই জীবন্মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

তাই বলি, উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ এবং নমঃশূদ্র বন্ধুগণ, এক্ষণে আসুন আমরা দুই জাতি, দুই সম্প্রদায়, এই চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, একদেহ, এক-জাতি, এক লক্ষ্য মনে করিয়া জাতীয় পতাকার মূলে একত্র হই। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করি। একজন অলস অকর্ম্মণ্য হইলে শরীরের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী কোন কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হয় না, বরং সমাজের ব্যাধিরূপে তাহার উন্নতির পথ রোধ করে। তাই বলি, ভাই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর আত্মহত্যার সাহায্য করিবেন না। সমাজের যাহার যে অবনতি থাকে, দূর করিতে চেষ্টা করুন, ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়িয়া দিন, সার্ব্বজনীন উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করা যাক। আমরা চিরদিন আত্মকলহ করিয়া বিনষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থরূপ জলবিন্দু সমগ্র ভারতীয় জাতির উন্নতি-মহাসাগরে মিশাইয়া দেও। যে যেখানে আছ, একত্র হও, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য দণ্ডায়মান হও। আমাদের ন্যায় জাপানও নানা ক্ষুদ্র স্বার্থে বিভক্ত ছিল। একদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী সগুণা, যে জাপান সম্রাটের সমকক্ষ ছিল, অপার ক্ষমতাপন্ন ছিল, সে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বলিল, 'একরাজ্যে দুই রাজা থাকিতে পারে না, সুতরাং আমি আমার রাজত্ব ত্যাগ করিলাম।' কি মহত্ত্ব! সসাগরা ধরণীর যুক্ত রাজত্ব ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নৃপতিগণ আসিয়া আপন রাজত্ব জাপান-সম্রাটের অধীন বলিয়া স্বীকার করিল। ভাবিয়া দেখুন, কি স্বার্থত্যাগ। যাহারা নিষ্কর জমীদারীর রাজত্ব ভোগ করিত, সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য তাহারা আপনা আপনি নিজের রাজ্যে

কর স্থাপন করাইল। সামুরিরা অর্থাৎ জাপানী ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা আপনারা অস্ত্র শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া দেশ শাসন করিত, তাহারা বলিল, সমগ্র জাতির কল্যাণের জন্য আমরা আমাদের অস্ত্রাদি জাপান রাজের পদতলে সমর্পণ করিলাম। সমগ্র জাতি স্বার্থত্যাগ করিল, নীচবাসনা দেশের মঙ্গলের শিবিরে বলিদান করিল। আপনার জীবন দেশের অনন্ত জীবনের জন্য বিসর্জ্জন দিল। তাই ক্ষুদ্র কয়েকটী দ্বীপপুঞ্জবাসী জাপানী আজি ইউরোপের আতঙ্ক, জগতে অভ্যুত্থানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আজি সমগ্র ভারতীয় জাতি একথা বলুন, দেশের মঙ্গলের জন্য, মাতৃভূমির উত্থানের জন্য, ভারতের উন্নতির জন্য আমরা আমাদের কৃত্রিম জাত্যভিমান বিসর্জ্জন করিলাম। বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি, মাদ্রাজের পারিয়া বা টারা জাতি ও অন্যান্য হীনাবস্থ জাতিগণ আজি, ভাই ভারতবাসী, তোমাদের সমক্ষে সমদর্শীতার জন্য দণ্ডায়মান। তোমরা বলিবে, ইংরাজ তোমাদের সমচক্ষে দেখে না। তোমরা কি বলিতে পার, তোমরা নিজেরা সমদর্শী? আগে সমদর্শীতা শিক্ষা কর, পরে সমান অধিকার চাহিও, নতুবা তোমরা যে সমস্ত উন্নত অধিকার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট চাহিতেছ, তাহা পাইবে না।

আর ভাই নমঃশূদ্র, তোমাদেরও বলি, তোমরা জানিয়া রাখ যে, প্রকাণ্ড এক মহান্ জাতির তোমরা এক অঙ্গ। তোমাদের উন্নতিতে সে জাতির উন্নতি, তোমাদের মঙ্গলে সে জাতির মঙ্গল, একথা ভুলিও না। শিক্ষালাভ কর, সামাজিক উন্নতি-বিধান কর। তোমাদের বাল্যবিবাহ, তোমাদের অল্পবয়স্কা বিধবাগণের দুরবস্থা, তোমাদের স্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষ শিক্ষার অভাব, এ সকল আমাদের প্রাণে বড় ক্লেশ প্রদান করে। তোমাদের যদি কোন দুরাচার থাকে, সমাজ-বক্ষে তাহা ছুরিকারূপে বিদ্ধ হয়। তোমরা আপনাদের সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির উন্নতি-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হও। তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষা, তোমাদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ, তোমাদের তৃতীয় কর্ত্তব্য ভ্রাতৃভাব। আজি ভ্রাতৃভাব ভারত ভুলিয়া গিয়াছে, তাই ভারত এত হীন, একবার তোমরা উত্থান কর; আমরাও উত্থান করি। জগৎবাসী দেখুক, আজি হিন্দুজাতি উচ্চ নীচ ভেদ দূর করিয়া, পরস্পর ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিত হইয়া, জগতের নিকট উন্নত পদবী লাভের জন্য প্রস্তুত ও উপযুক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের চিরবাসনা পূর্ণ করুন।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

১

পূর্ব্ব গগনের রবি গেছে অস্তাচলে,
নাহি আর সূর্য্যকান্ত দীপ্ত বিবস্বান,
কর্ম্মবীর চলে গেছে কর্ম্ম অবসানে
রাখিয়া বিপুল কীর্ত্তি গৌরব সম্মান!

সে যে ছিল বসোরার সুরভী গোলাপ,
রূপে গুণে অতুলন শোভার ভাণ্ডার,
যদিও ঝরিয়ে গেছে ঝঞ্ঝার পীড়নে,
সুরভী কি হইয়াছে বিলুপ্ত তাহার?

প্রতিজ্ঞায় অবিচল—দৃঢ়তা কঠোর,
যাহা সত্য,যাহা ধ্রুব,তাহাতেই মতি,
দূরিতে অজ্ঞান-নিশা দীন ভারতের
সে যে ছিল একনিষ্ঠ কর্ম্মব্রতে ব্রতী।
সূর্য্যত যায়নি অস্ত, হয়েছে উদয়
কোটি কণ্ঠে শোন ওই তাঁরি জয় জয়।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

২

অহো। কিবা কুসংবাদ, কিবা অমঙ্গল
ঘটিল এ বঙ্গমাঝ,
সূর্য্যকান্ত মহারাজ,
ত্রিদিবে গেছেন ত্বরা, ত্যজিয়া সকল।

৩

সূর্য্যকান্ত ছিল শৌর্য্যে সূর্য্যেরি যতন,
সারাদিন অংশু ঢালি,
দিবাশেষে অংশু-মালী,
অস্তাচলে চিরতরে করেছে গমন!

৪

ফিলিপ্স করিয়াছিল নিগ্রহ যখন,
তখনো সুধীর পদে,
আপন কর্ত্তব্য পথে,
হে কর্ত্তব্যপরায়ণ। করেছ গমন।

৫

পূর্ণিমার শশী যথা, মধ্যাহ্নের রবি,
প্রভাতের ফুল যথা,
বসন্তের লতা পাতা,
সতেজ সুন্দর যথা দেবতার ছবি।

৬

তেমনি ছিলে হে তুমি ওহে নরোত্তম!
অনিন্দ্য অপূর্ব্ব কান্তি,
নাহি ছিল ভুল,ভ্রান্তি,
অকৃত্রিম দেশভক্ত কেবা তব সম?

৭

হেন পত্নীপরায়ণ বিরল জগতে,
পত্নী গেলে লোকান্তরে,
ভাসিয়া নয়নাসারে,
"জলছত্র" দিয়েছিলে শোকাচ্ছন্ন চিতে।

৮

প্রিয়তমা প্রণয়িনী স্বর্গারূঢ় হলে,
না করি বিবাহ আর,
পরিচয় দিলে তার,
তুমি যে দেবতা, দেব,এ মহীমণ্ডলে।

৯

প্রেম, পুণ্য, প্রজ্ঞাবান, প্রাণভরা মায়া,
মহাশয়, মহারাজা,
দেশশুদ্ধ করে পূজা,
বঙ্গ-ভূমি হেন ক্ষতি পূরাবে কি দিয়া?

১০

গৌরব-কিরণ! আলো করেছিলে তুমি,
তোমারে হারায়ে আজ,
খসিয়া পড়িল বাজ,
বঙ্গের বিদীর্ণ বক্ষে, জানে বিশ্ব-স্বামী।

১১

সুলেখক, গুরু, শান্ত, সূর্য্যকান্ত রাজ,
মধুময় পুষ্প যূথ,
সুধারা আকাশের মত,
কেননা রহিলে পেয়ে এত প্রীতি পূজা?

১২

সূর্য্য অস্ত যায় দেব! দিবা অবসানে,
আবার প্রভাত হলে,
আইসে উদয়াচলে,
আলোক জুড়িয়া পড়ে,সুখ ফোটে প্রাণে।

১৩

তুমি সূর্য্য হলে কেন চির-অস্তমিত?
ফিরিয়া এসহে দেব!
জনম ভূমিরে সেব,
মায়েরে করিয়া তোল পুনঃ জাগরিত।

১৪

চির জনমের মত গিয়েছ কি তুমি ?
আর না আসিবে ফিরে,
এ ক্ষণভঙ্গুর ঘরে,
ত্যজিলে ত্রিদিব-রাজ্য সুধা মাখা ভূমি ?

১৫

থাক তবে স্বর্গরাজ্যে, থাক গুণধর,
তোমার অক্ষয় যশ,
সিক্ত সঞ্জীবনী-রস,
জীবিত রাখিবে তোমা অবনী উপর।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা।

শঙ্করের দার্শনিক মত।

শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, এম-এ, মহাশয় 'উপনিষদের উপদেশ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে ইহার প্রথমখণ্ডের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। ইহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, গ্রন্থ খানা আগাগোড়া আত্মবিরোধে পূর্ণ এবং ইহাতে শঙ্কর-দর্শনের অতি বিকৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমালোচনাটী গ্রন্থকারের মনঃপূত হয় নাই। সেই জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিবা অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে একটী প্রবন্ধ বাহির করেন। মাঘ মাসের প্রবাসীতে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থকার ইহার আর কোন জবাব দিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রথম সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থকার ১৩১৪ সালের কার্ত্তিক মাস হইতে নব্য-ভারতেও প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। ইহার জবাব দিবার জন্য নব্যভারতের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ শেষ না হওয়ায়, সম্পাদক মহাশয় এপর্য্যন্ত আমাকে অনুমতি দেন নাই। এই জন্যই আমাকে বৎসরাধিক কাল মৌনব্রতী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। কোকিলেশ্বর বাবু অল্পদিন হইল উপনিষদের উপদেশ,দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত করিয়াছেন। নব্যভারতে আমার মতামত প্রতিবাদ করিয়া যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া উক্ত গ্রন্থের 'অবতরণিকা' নামে মুদ্রিত করিয়াছেন। সুতরাং, আবশ্যক হইলে,আমরা এ গ্রন্থেরও সমালোচনা করিব। বর্ত্তমান মাসের (অগ্রহায়ণ মাসের) 'প্রবাসী'তে ইহার যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেও পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় উপনিষদের কি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। ব্রহ্ম শক্তি স্বরূপ কি না। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন, শঙ্করের মতে "নির্গুণ ব্রহ্ম, পূর্ণ-শক্তি-স্বরূপ" (নব্যভারত, ১৩১৪, পৃঃ ৩৫৫)। আমাদিগের বিশ্বাস, শঙ্কর ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ নহে, ব্রহ্ম শক্তির আধার ও নহেন এবং শক্তি ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। শঙ্করের মতে শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান, অধ্যাস, ভ্রম, মোহ, অবিবেক সমুদয়ই সমপর্য্যায়ের কথা। মূর্খদিগের বিশ্বাস, এই মায়ার অস্তিত্ব আছে;

যাঁহারা যুক্তি তর্ক দ্বারা ইহার তত্ত্ব নিরূপণ করিতে চাহেন, তাহারা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পাবেন না, কিন্তু বিদ্যার চক্ষে এই মায়াব অস্তিত্ব নাই। প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনা করাই দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আমরা প্রমাণ করিব যে শঙ্করের মতে, দার্শনিক ভাবে, পারমার্থিক ভাবে, এই মায়ার অস্তিত্ব নাই।

বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজমত সমর্থন করিবার জন্য শঙ্কর-ভাষ্য হইতে যে সমুদয় স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখা যাউক, সেই সমুদয় অংশ দ্বারা তাঁহার মত সমর্থিত হয় কিনা।

শঙ্করভাষ্যে আছে—'নহি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি, শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"—বেঃ ভাঃ ১।৪।৩। জগতের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এই বিষয় বিচার কবিবাব সময় শঙ্কর পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাব প্রকৃত অনুবাদ এই "ইহা ব্যতীত (অর্থাৎ জগতেব প্রাগবস্থা স্বীকার না করিলে) পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, তিনি শক্তি রহিত, সুতরাং তাঁহার (সৃষ্টি) প্রবৃত্তি হইতে পারে না"। 'শক্তিরহিতস্য তস্য' এই অংশের অর্থ—'শক্তিরহিত সেই পরমেশ্বরের'। এখানে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, 'পরমেশ্বর শক্তি-রহিত'। অথচ এই অংশ দ্বারাই বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে 'ব্রহ্ম শক্তি-স্বরূপ।" কি কৌশলে তিনি ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা কি জানিতে চাহেন? তবে শ্রবণ করুন। বিদ্যারত্ন মহাশয় 'শক্তি-রহিতস্য তস্য' অংশের 'তস্য' অংশটা গোপন করিয়াছেন। মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ যে এই প্রকার ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ 'নব্যভারত' ও 'প্রবাসী' উভয় পত্রিকাতেই 'তস্য' শব্দটী অপ্রকাশিত। নব্যভারতের দুইটী স্থলে ঐ অংশটী উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন স্থলেই 'তস্য' শব্দটী খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। নব্যভারতে ঐ অংশের অনুবাদ দেওয়া হয় নাই; অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে প্রবাসীতে। অনুবাদটী এই :—'এই শক্তি স্বীকাব না করিলে, ব্রহ্ম সৃষ্টি করিবেন কাহার দ্বাবা? শক্তিরহিত পদার্থের প্রবৃত্তি হইতে পারে না।' লেখকের যুক্তি বিশ্লেষণ করিলে দাঁড়ায় এই—'শক্তি ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয় না, সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি আছে।' কিন্তু শঙ্করের বক্তব্য এই—'ব্রহ্মে শক্তি নাই, সুতরাং ব্রহ্মে সৃষ্টি প্রবৃত্তি হইতে পারে না'। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জগৎ সৃষ্ট হইল কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই—'জগতের একটা প্রাগবস্থা স্বীকার কর, সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে। এই প্রাগবস্থা অবিদ্যা কিম্বা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।' কিন্তু লেখকের বুঝাইবার ইচ্ছা 'ব্রহ্ম শক্তি-স্বরূপ; তিনি সেই শক্তি দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।' শঙ্করের সব অংশ উদ্ধৃত করিলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, এইজন্য বিদ্যারত্ন মহাশয়কে 'তস্য' অংশ টুকু গোপন করিতে হইয়াছে। গোপন করিলে অবশ্যই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয়। উদ্ধৃত অংশের ঠিক পরেই শঙ্কর বলিয়াছেন—"মুক্তানাঞ্চ পুনরনুৎপত্তিঃ, বিদ্যয়া তস্যা বীজশক্তের্দাহাৎ। অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিঃ, অব্যক্ত শব্দ নির্দ্দেশ্যা, পরমেশ্বরাশ্রয়া, মায়াময়ী, মহাসুষুপ্তিঃ যস্যাং স্বরূপ প্রতিবোধ রহিতাঃ শেরতে সংসারিণোজীবাঃ"—অর্থাৎ, জগতের এই বীজ-শক্তি-রূপিণী পূর্ব্বাবস্থা, অবিদ্যাত্মিকা। বিদ্যা দ্বারা এই বীজশক্তি দগ্ধ হইয়া যায়, এই জন্যই মুক্ত-

আত্মাদিগের আর জন্ম হয় না। ইহার অপর নাম অব্যক্ত। ইহা পরমেশ্বরের আশ্রিত; ইহা মায়াময়ী ও মহাসুষুপ্তি, সংসারী জীব প্রতিরোধ শূন্য হইয়া ইহাতেই শয়ান থাকে।" বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহাকে ব্রহ্ম শক্তি বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা অবিদ্যা, মায়া ও মহা সুষুপ্তি। যে অবিদ্যাতে প্রতিরোধ-শূন্য হইয়া সাংসারিক জীব শয়ান থাকে, তাহা কি ব্রহ্ম? যাহাকে মহাসুষুপ্তি বলা হয়, তাহা কি ব্রহ্ম-স্বরূপ? ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ; তাঁহাকে সুষুপ্ত বলা মহামূর্খতা। ব্রহ্ম 'বিদ্যাস্বরূপ', তাঁহাকে অবিদ্যাস্বরূপ (=শক্তি-স্বরূপ) বলা, আর ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব কাড়িয়া লওয়া, একই কথা। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলেন "ব্রহ্ম শক্তিস্বরূপ"; তিনি আরও বলেন, শক্তি = অবিদ্যা = অজ্ঞান (নব্যভারত, পৃঃ ৩৫৩, উপঃ উপদেশ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮)। সুতরাং, দাঁড়াইল এই যে ব্রহ্ম 'অবিদ্যাস্বরূপ' বা অজ্ঞানস্বরূপ', অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ। বিদ্যারত্ন মহাশয় কি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'বিদ্যা-দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংস হইয়া যায়'। অবিদ্যা ও ব্রহ্মস্বরূপ যখন একই কথা এবং অবিদ্যা যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন বলিতেই হইতেছে যে ব্রহ্মস্বরূপও ধ্বংস হইয়া যায়। আবার, অবিদ্যাকে ধ্বংস করিবার জন্যই বেদান্তের জন্ম; সুতরাং, ব্রহ্মকে ধ্বংস করিবার জন্যই বেদান্তের জন্ম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত গ্রহণ করিলে এই প্রকার অদ্ভুত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। 'অবিদ্যা বিনা পরমেশ্বরের স্রষ্টৃত্ব "অসম্ভব"—ইহা অতি সত্য কথা। বিদ্যাকে কখনঃ অবিদ্যার কারণ বলা যায় না; পরমেশ্বর বিদ্যাস্বরূপ, আর সৃষ্টি অবিদ্যা-মূলক; সুতরাং, পরমেশ্বরকে স্রষ্টা বলা অসম্ভব। যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই অবিদ্যা; সুতরাং ব্রহ্মকে অবিদ্যাগ্রস্ত বলিয়া স্বীকার না করিলে, তাঁহাকে আর স্রষ্টা বলা যাইতে পারে না। অবিদ্যার জন্যই সৃষ্ট্যাদি কল্পনা। অবিদ্যার একটী নাম 'অধ্যাস' (বেদান্ত ভাষ্য-বস্তু)। 'যে বস্তু'তে যাহা নাই, সে বস্তুতে তাহা আছে' এইরূপ ভ্রম হওয়ার নামই 'অধ্যাস'। ব্রহ্মে স্রষ্টৃত্বাদি কিছুই নাই, অধ্যাসবশতই মনে হয়, তিনি স্রষ্টা। সাধারণ লোকে এই ভ্রম বিশ্বাসবশতই সৃষ্টিতত্ত্বে আস্থা স্থাপন করে। আমরা পরে প্রমাণ করিব যে সৃষ্ট্যাদি বলিয়া কিছু নাই। লোক-শিক্ষার জন্যই সৃষ্ট্যাদির গল্প রচনা করা হইয়াছে।

অবিদ্যাকে ব্রহ্মের আশ্রিত বলা হইয়াছে, ইহাও সত্য। মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যে (৯) শঙ্কর বলিয়াছেন "মিথ্যা কল্পনারও একটী কারণ না থাকিলে চলে না। শুক্তিকা, রজ্জু, স্থাণু, উষরাদি না থাকিলে রজত, সর্প, পুরুষ ও মৃগতৃষ্ণিকার কল্পনা হইতে পারে না। এস্থলে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 'পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে তুরীয় ব্রহ্মকে প্রাণাদি কল্পনার আস্পদ বলা হইল; সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে ঘটাদি যেমন জলাদির আধার, তেমনি ব্রহ্মও প্রাণাদির আধার। সুতরাং, ব্রহ্ম নিরুপাধি একপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে'। এ প্রকার আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ শুক্তিকাতে যেমন রজতাদি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,—এস্থলে যেমন রজতাদি অস্তিত্ব-বিহীন—প্রাণাদি কল্পনাও তেমনি অস্তিত্ব-বিহীন (প্রাণাদি বিকল্পস্য অসত্বাৎ শুক্তি-কাদিষু ইব রজতাদেঃ)। সৎ ও অসতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবস্তু, এই

জন্য বাক্য দ্বারা ইহা প্রকাশ করা যায় না (ন হি সদসতোঃ সম্বন্ধঃ শব্দপ্রবৃত্তি নিমিত্ত ভাক্ অবস্তুত্বাৎ)।

প্রাণ অর্থ হিরণ্যগর্ভ (উপঃ উপদেশ, ২য় ভাগ, ১৫৬ পৃঃ)। দেখা যাইতেছে, হিরণ্য গর্ভাদি সগুণ ব্রহ্ম অস্তিত্ববিহীন, ব্রহ্মকে এ সমুদয় কল্পনার আস্পদ বলিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে এ সমুদয়ের আধার বলা যাইতে পারে না।

'অবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত' ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার যে অংশ (১।৪।৩) উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই অংশেরই 'ভামতী' টীকাতে 'আশ্রিত' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—"প্রপঞ্চবিভ্রমস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠানত্বম্ অহিবিভ্রমস্য ইব রজ্জ্বধিষ্ঠানত্বম্," অর্থাৎ, সর্পভ্রম যে অর্থে রজ্জুর আশ্রিত, ঠিক সেই অর্থেই প্রপঞ্চ বিভ্রম ঈশ্বরের আশ্রিত। 'ভামতী' স্পষ্টই বলিয়াছে, ব্রহ্ম অবিদ্যার আধার নহেন—'ন তু আধার তয়া'। ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হয়—এই অর্থে অবিদ্যা ব্রহ্মের আশ্রিত। প্রকৃত কথা এই, যেমন রজ্জুই প্রকৃত সত্তা, সর্প জ্ঞান মিথ্যা, তেমনি ব্রহ্মই প্রকৃত সত্তা, অবিদ্যা-মূলক জগতাদি মিথ্যা বস্তু। সর্পাদির ন্যায় এসমুদয়ও অস্তিত্ববিহীন।

২। বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন "শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত দর্শনের ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে নির্গুণ ব্রহ্মই যে জগৎ-স্রষ্টা, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন"। আমরা কিন্তু উক্ত ভাষ্যে বিপরীত কথাই পাইতেছি। শঙ্কর বলিতেছেন—

সৃষ্ট্যাদি প্রপঞ্চ প্রতিপাদন করা এসমুদয় (সৃষ্টি) শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। কারণ, এই সমুদয়ের জ্ঞানে কোন প্রকার পুরুষার্থ দৃষ্টও হয় না, শ্রুতও হয় না এবং এ প্রকার কল্পনা করা সম্ভবও নহে। ......সম্প্রদায়বিদ্গণও বলিয়া থাকেন—"মৃত্তিকা, লৌহ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা সৃষ্টির কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মকে জানিবার উপায়-স্বরূপ, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাতে কোন প্রকার ভেদ নাই।" ১।৪।১৪ ভাষ্য।

এই শেষ শ্লোকটী গৌড়পাদীয়কারিকা হইতে উদ্ধৃত। শঙ্কর উক্ত শ্লোকের এই প্রকার ভাষ্য লিখিয়াছেন—

প্রশ্ন হইতে পারে, "উৎপত্তির পূর্ব্বে সমুদয়ই এক অদ্বিতীয় বস্তু ছিল, কিন্তু এই সমুদায় জীব উৎপন্ন হইবার পর, ভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছে।" ইহার উত্তর 'না', ইহা হইতে পারে না। কারণ, উৎপত্তি সংক্রান্ত শ্রুতির অন্য অর্থ আছে। ...মৃত্তিকা, লৌহ বিস্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তের উপন্যাস দ্বারা যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা জীব ও পরমাত্মার একত্ব জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ। যেমন প্রাণ সংবাদে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্য, বাগাদি, অসুর, পাপ্মা, বেধা ইত্যাদির আখ্যায়িকা কল্পনা করা হইয়াছে, সৃষ্টি ব্যাপারেও তাহাই। (ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে কে বড় এই বিষয় লইয়া কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। একটী আখ্যায়িকার দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, প্রাণই শ্রেষ্ঠ। শঙ্করাচার্য্যের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে, কোন বিবাদ হয় নাই, প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ঐ গল্প রচনা করা হইয়াছিল)। সুতরাং আত্মার একত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন করিবার জন্যই উৎপত্তি-সূচক শ্রুতি। ইহার অন্য অর্থ কল্পনা করা যুক্তি যুক্ত নহে। সুতরাং উৎপত্তি মূলক যে ভেদ, সে ভেদ কখনই স্বীকার করা যায় না" । গৌঃ কাঃ ভাষ্য ৩।১৫।

দেখা যাইতেছে যে ১।৪।১৪ সূত্রের ভাষ্যে

সৃষ্টিকে একটী গল্প বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যারত্ন মহাশয় যাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার বিরোধী কথাই প্রমাণিত হইয়া গেল।

৩। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐতরেয় ভাষ্য হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও একটী গুরুতর কথা গোপন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত করিয়াছেন এই অংশ—"সর্ব্বোপাধি বর্জ্জিতং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং··· সর্ব্বসাধারণা ব্যাকৃত জগৎ বীজ প্রবর্ত্তকং।" সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন নব্যভারতে, কিন্তু অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে 'প্রবাসী'তে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদ এই—"অব্যাকৃত শক্তিই এই জগতের বীজ। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মই এই অব্যাকৃত শক্তির প্রবর্ত্তক। নির্গুণ ব্রহ্ম দ্বারাই এই শক্তি জগৎরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।" মূল ও অনুবাদ উভয় স্থলেই "উপাধি সম্বন্ধেন" কথাটী গোপন করা হইয়াছে। কেন গোপন করা হইয়াছে, পাঠকগণ বুঝিয়াছেন কি? উপাধি কথাটীর অর্থ জানিলেই এ রহস্য বুঝা যাইবে। বাচস্পতির অভিধানে 'উপাধি' শব্দের অর্থ এইরূপ—"'অন্যথা স্থিতস্য বস্তুনোঽন্যথা প্রকাশন রূপে', অর্থাৎ, এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার প্রতীত হইলে, উপাধি শব্দ ব্যবহৃত হয়। "অথোপাধিঃ স উচ্যতে যদ্ধর্ম্মোঽন্যত্র প্রতিবিম্বতে, যথা জবা কুসুমং স্ফটিক লৌহিত্য উপাধিঃ।" "যে বস্তুর ধর্ম্ম অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বস্তুকে তাহার উপাধি বলা হয়; যেমন জবা কুসুমের লৌহিত্য স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইলে, জবা কুসুমকে স্ফটিকের উপাধি বলা হয়।" 'ঔপাধিক' শব্দের অর্থ এই:—উপাধিজনিতে: মিথ্যাভূতে আরোপিতে, স্ফটিক লৌহিত্যাদৌ জবা সন্নিকর্ষাৎ স্ফটিকে চ মিথ্যাভূতং লৌহিত্যমুৎপদ্যতে ইতি বেদান্তিনঃ।" শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য স্থলে এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাধিকে বর্ণনা করিয়াছেন। স্ফটিকের নিকটে জবা কুসুম থাকিলে, স্ফটিককে লোহিত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু স্ফটিক কখন লোহিত হয় না। সেই প্রকার উপাধি যোগে (সে উপাধি বিশুদ্ধই হউক বা অবিশুদ্ধই হউক) নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম কখন সগুণ হয়েন না। ঐতরেয় উপনিষদেও শঙ্কর ইহাই বলিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অংশ বিশেষ গোপন করিয়া ভাষ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হইতে পারে, সগুণ ব্রহ্ম বুঝি নির্গুণ ব্রহ্মেরই অবস্থা বিশেষ। এই জন্য আমরা নিম্নে ভাষ্যের প্রকৃত অনুবাদ দিতেছি। প্রকৃত অনুবাদ এই—

তিনি সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত, নিরঞ্জন, নির্ম্মল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, অদ্বিতীয়, 'নেতি-নেতি'—'ইহা নয়' 'ইহা নয়'—এই প্রকার সর্ব্ব বিশেষ বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে জানিতে হয়। তিনি সমুদয় বাক্য ও চিন্তার অগোচর। অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা-রূপ উপাধি বশতই ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, অব্যাকৃত জগদ্বীজের প্রবর্ত্তক এবং অন্তর্য্যামী সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যে বুদ্ধি ব্যাকৃত জগতের বীজস্বরূপ, সেই বুদ্ধিতে আত্মাভিমান হইলেই তিনি হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞা লাভ করেন। অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া শরীর রূপ উপাধির সহিত যুক্ত হইলেই ইঁহাকে বিরাট প্রজাপতি বলা হয়। তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্ন্যাদি উপাধিযুক্ত হইলেই তিনি দেবতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। বিশেষ বিশেষ শরীররূপ উপাধি সংযোগেই ইঁহার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নানাপ্রকার নাম হইয়া থাকে।

বুঝা যাইতেছে যে উপাধির জন্যই ব্রহ্মের বিভিন্ন নাম। এই উপাধির জন্যই ব্রহ্মকে হিরণ্যগর্ভ, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, বিরাট, প্রজাপতি, দেবতা, কীট, পতঙ্গাদি নাম দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্ব্বোপাধি-বর্জ্জিত।

৪। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিশ্বাস ২।১।২৭ সূত্রের ভাষ্যদ্বারাও তাঁহার মত সমর্থিত হয়। নিম্নে শঙ্কর ভাষ্য অনূদিত হইল:—

"(পূর্ব্বপক্ষ)—তোমরা বলিতেছ নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হয়েন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ পরিণাম হয় না। তোমাদের একথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ব্রহ্ম যদি নিরবয়বই হ'ন,তাহা হইলে, হয় বল, তাঁহার পরিণামই হয় না, না হয় বল, তাঁহার পূর্ণ পরিণাম হয়। যদি বল ব্রহ্ম একরূপে পরিণত হয়েন এবং অপররূপে স্বরূপে অবস্থান করেন—তাহা হইলে প্রথমতঃ ব্রহ্মের রূপভেদ কল্পনা করা হয়, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করা হয়। সুতরাং তোমাদের কথা অযৌক্তিক।"

(সিদ্ধান্তী)—ইহাতে দোষ নাই, কারণ এই যে ব্রহ্মের রূপ-ভেদ-কল্পনা,—ইহা অবিদ্যা-কল্পিত। অবিদ্যা-কল্পিত রূপভেদ স্বীকার করিলেই যে বস্তু অবয়ব বিশিষ্ট হইবে, তাহা নহে। নেত্রের তিমির দোষ হইলে, এক চন্দ্রকে বহু চন্দ্র বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে; কিন্তু চন্দ্র কখন অনেক হয় না। তেমনি নাম-রূপ-মূলক রূপ ভেদ অবিদ্যামূলক। ইহা ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উভয়াত্মক। ইহা সৎ কি অসৎ কিছুই বলা যায় না। এই অনির্ব্বচনীয় ভেদবশতঃই ব্রহ্মকে পরিণামী ও সর্ব্বব্যবহারাস্পদ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পারমার্থিক রূপে তিনি সর্ব্বব্যবহারের অতীত ও অপরিণামী। পরিণাম শ্রুতিসমূহ (অর্থাৎ, যে সমুদয় শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম এই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, সেই সমুদয় শ্রুতি) পরিণাম প্রতিপাদন করিবার জন্য অভিহিত হয় নাই; কারণ এ প্রকার উপদেশে কোন ফল নাই। সর্ব্বব্যবহারবিহীন ব্রহ্মাত্মভাব প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য, কারণ এ প্রকার উপদেশের ফল আছে।"

সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে—(১) ব্রহ্মের কখন পরিণাম হয় না, (২) নামরূপাদি সমুদয়ই অবিদ্যা-কল্পিত। (৩) পরিণাম শ্রুতি সমুদয়ের অর্থ ইহা নহে যে ব্রহ্ম রূপান্তরিত হইয়াছেন—ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশ করিবার জন্যই এই সমুদয়ের অবতারণা।

৫। বিদ্যারত্ন মহাশয় নিজমত সমর্থনের জন্য ২।১।৩১ বেদান্ত ভাষ্য হইতে এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "প্রতিষিদ্ধ সর্ব্ব বিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ।" ইহা উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন "অতএব আমরা দেখিতেছি শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ ব্রহ্মেই শক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এই শক্তিদ্বারাই নির্গুণ ব্রহ্মই জগৎ কারণ" (নব্যভারত, পৃঃ ৩৫৫)। আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, বাক্যের শেষ অংশটুকু গোপন করিলেন কেন? গোপনীয় অংশটুকু এই—"এতদপি অবিদ্যা-কল্পিত রূপভেদোপন্যাসেন উক্তমেব"—অর্থাৎ, ইহা অবিদ্যা কল্পিতরূপ ভেদ প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। সমস্ত অংশের অর্থ এই:—

"ব্রহ্মে কোন প্রকার বিশেষ নাই, একমাত্র অবিদ্যাবশতই তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা হয়।"

দেখা যাইতেছে, এ অংশদ্বারাও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অতুক্ত

তাঁহার বিরোধীমতই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

৬। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঈশোপনিষদের ভাষ্য দ্বারাও নিজ মত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মূলে আছে "সর্ব্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্ব্ব সংসার-ধর্ম্ম-বর্জ্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেন অক্রিয়মেব সৎ উপাধিকৃতা সর্ব্বাঃ সংসার ক্রিয়া অনুভবতি ইব।" লেখক অনুবাদ করিয়াছেন, "এই প্রাণশক্তি অবিক্রিয় ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়া জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।" প্রকৃত অনুবাদ এই— সর্ব্ব-সংসার-ধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপী আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় নিরুপাধিক স্বরূপে নিষ্ক্রিয় হইলেও উপাধিজনিত সংসার কার্য্য অনুভব করিতেছে বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ ভ্রম হয়।" "অনুভবতি ইব" এই অংশের অর্থ "যেন অনুভব করিতেছেন।" "ইব" শব্দ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য বুঝাইতেছেন যে, তিনি সংসার কার্য্য অনুভব করেন না, কিন্তু তিনি করেন এইরূপ ভ্রম হয়।

ঠিক ঐ মন্ত্রেই (ঈশ, ৪) আছে "তৎ ধাবতঃ অন্যান্ অত্যেতি তিষ্ঠৎ" অর্থাৎ তিনি স্থির থাকিয়াও দ্রুতগামী অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। এখানে 'অত্যেতি' শব্দের অর্থ 'অতিক্রম করিয়া যান', কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে 'অত্যেতি = অত্যেতি ইব' অর্থাৎ মনে হয় যেন অতিক্রম করিয়া যান। এখানেও 'ইব' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। শঙ্কর প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা বিচার করিতেছি না। আমাদিগের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উক্ত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ব্রহ্মে কোন শক্তিই স্বীকার করিতেছেন না। 'ইব' শব্দের ব্যবহার দ্বারা তিনি সমুদয় কার্য্যকেই ভ্রমাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ বিদ্যারত্ন মহাশয় সগর্ব্বে বলিতেছেন—"ইহা অপেক্ষা আর কি সুস্পষ্ট উক্তি থাকিতে পারে? নির্গুণ ব্রহ্মই যখন সৃষ্টি কার্য্যে নিযুক্ত, তখনই তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। বস্তুতঃ নির্গুণে ও সগুণে কোন ভেদ নাই।"

৭। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কঠোপনিষদের ভাষ্য হইতেও অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অংশের অনুবাদ নব্যভারতে না দিয়া প্রবাসীতে দিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই:—'অব্যক্তই জগতের মূলবীজ। জগতে প্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য ও কারণ শক্তির এই অব্যক্তই মূল বীজ। বটকণিকায় যেমন বটবৃক্ষের বীজ নিহিত থাকে, তদ্রূপ এই অব্যক্ত শক্তি ব্রহ্মে নিহিত আছে"। 'ভাষ্যে নিহিত' শব্দ নাই— আছে সমাশ্রিত। বেদান্ত ভাষ্যের ১।৪।৩ অংশের অনুবাদ সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, এই অব্যক্ত = অবিদ্যা। জ্ঞান দ্বারা ইহা দগ্ধ হইয়া যায়। শঙ্কর কি অর্থে এই অব্যক্তকে ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'অহিবিভ্রম যেমন রজ্জুর আশ্রিত, তেমনি প্রপঞ্চ বিভ্রমও পরমেশ্বরের আশ্রিত'।

বিদ্যারত্ন মহাশয় যে কঠোপনিষদ্ভাষ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই উপনিষদের ভাষ্যেই এক স্থলে (৫।১১) শঙ্কর বলিয়াছেন, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন রজ্জুর সহিত সর্পের কোন সংস্পর্শ হয় না; তেমনি ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস হইবে, অবিদ্যার সহিত ব্রহ্মের সংযোগ হয় না—সংযোগ হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। পরে এই অংশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইবে।

৮। কোকিলেশ্বর বাবু বেদান্ত ভাষ্য হইতে